সুসাহিত্যিক ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

স্থলপদ্ম

গ্রামের প্রান্তে পায়রাখুপির মত ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা,—কালিপড়া হাঁড়ির গাদা, ছাইয়ের রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী; অধিবাসীগুলা ওই আবর্জনার মতই নোংরা, কালিমাখা হাঁড়িগুলার মতই গায়ের রং, দেহের কাঠামো খাপছাড়া রকমের দীর্ঘ, পায়ে মাংস নাই, মেয়েগুলাও তাই, তার উপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়,—মাথায় খাটো চুলে যোগান দিয়া বিঁড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা—তাহাতে অগুন্‌তি বেলকুঁড়ির সারি, পরণে বাহারে পাড় শাড়ী, কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি!

ছোটলোকের দল সব, সমাজে আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতই পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যার মুখ, করখানা ঘরের এজমালী আঙিনায় তাহাদের বৈঠক বসিয়াছে, এখানে পাঁচ সাতজন, ওখানে চার পাঁচ জন, আর খানিকটা সরিয়া আরও দুই-তিন জন,—নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ।

একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে, পেটজোড়া পিলে লইয়া, বুকের হাড়-পাঁজরা একখানা করিয়া গণা যায়, উৎকট নৃত্যের সঙ্গে মিহি গলায় ঘেঁটু গান গাহিতেছে:—

সায়েব আস্তা বানালে,
ছ' মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে।
সায়েব আস্তা…

একটা বিশ বাইশ বছরের জোয়ান ছোকরা মুখে তবলা বাজাইতেছে—

গুব্ গুব্ গুবং···

আর সকলে হুঁকা টানিতেছে, গান শুনিতেছে; মেয়ের দল কিছু উচ্ছল চঞ্চল।

ছেলেটা অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া গানটার শেষ কলি গাহিল—

"পুল ভেঙে নদীর জলে সাহেব চিংপটাং
ওগো তোরা, ভেসজ্জনের বাজনা বাজা,
ড্যাং ড্যানা ড্যাং ড্যাং।"

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল; পুরুষেরা মুখে বাজনা বাজাইয়া উঠিল—ন্যাটাং ড্যাটাং। তবলচী বোল ভুলিয়া কহিয়া উঠিল—ন্ত ড্যাটাং···। গাইয়ে ছেলেটা তবলচীর মাথায় চাঁটি মারিয়া বাজনাটা শেষ করিল—ড্যাং ড্যাং—ড্যাং।

হাসির স্রোতে কৌতুকের হাওয়ায় ঢেউটা কিছু জোর উঠিল, এবার পুরুষের দলও হাসিল—কিন্তু মেয়েদের মিহি গলার তীক্ষ্ণ হাসি মোটা গলার উচ্ছ্বসিত হাসি ছাপাইয়া উঠিল।

তবলচী ছোকরা সকলের, বিশেষ ওই নারীকণ্ঠের হাসিতে অপ্রস্তুত হইয়া একটা গালি দিয়া ছেলেটার পিঠে বেশ জোরেই কিল বসাইয়া দিল, ছেলেটা চেঁচাইতে লাগিল, ভঁ্যা ভঁ্যা ভঁ্যা······মেয়ের দল হাসিয়া এলাইয়া পড়িল।

তবলচী একজনের হাত হইতে হুঁকা টানিতে বসিল।

খানিকক্ষণ চেঁচাইয়া ছেলেটা এক হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে অপর হাতখানা বাড়াইয়া বলিল—"দে হুঁকো দে, মারবি আবার তামুকও খাবি?"

তবলচী বলিল—"হুঁকোর ঘেটুটো বল, তবে দোব।"

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আবার নৃত্য সহকারে পরমানন্দে গান জুড়িয়া দিল—

ঈশেন কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা কল্লে শুকো,

এক ছেলম তামুক দাও গো, সঙ্গে আছে হুঁকো—"

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের দল মিহি, মোটা, কড়া মিঠে একটা উৎকট সমাবিষ্ট স্বরে ধুয়া ধরিয়া দিল—

"ও ভাই হুঁকো পরম ধন, হুঁকো নইলে জমেনাকো ভারতরামায়ণ।

ও ভাই হুঁকো·········।"

তবলচী এবার নিকটেরই এক যুবতীর মাথা বাজাইয়া বোল ধরিল—তাক্—তেরে—তাক···।

মেয়েটা মাথা লইয়া মাথার চুল বসাইতে বসাইতে গালি দিয়া উঠিল—"আ—মর, মর।"

মেয়ের দল কৌতুকের কাতুকুতুতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সহসা হাসির রোল ছাপাইয়া একটা বুকফাটা আর্তস্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

"ওরে—বাবা—আমার রে—।"

দমকা হাওয়ায় আলোটা নিভিয়ে গেলে অন্ধকার যেমন প্রকট হইয়া উঠে—ঠিক তেমনি ভাবেই মজলিসের সকল উচ্ছ্বাস নিভিয়া সব যেন গুম্ হইয়া উঠিল—

একজন বলিল,—"রাখার ছেলেটা বুঝি ?"

আর একজন বলিল—"হ্যাঁ, ওরই তো হয়েছিল। ঐ যে রাখা পড়ে আছে। রাখা, ও রাখা—।" রাখা মদের নেশায় বেহুঁস। সে গড়াইতেছিল, উত্তরে জড়িতকণ্ঠে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল।

"—ওরে শালা ওঠ, তোর ছেলেটা যে···।"

রাখা জড়িতকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

'ছেলের তরে ভাবনা কিরে বেঁচে থাকুক ষষ্ঠী বুড়ী।'

ওদিক হইতে রাখার স্ত্রীর কণ্ঠের করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—"ওরে বাবা রে···"

ওই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলির মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—মৃত্যুর কথা, গ্রামে কলেরা হইতেছে। বৈঠকের সকল চটুলতার সমাপ্তি হইয়া বিভীষিকায় লোকগুলা হাঁপাইয়া উঠিল, সকলেই যেন দিশেহারা হইয়া চুপ হইয়া গেল।

একটা মেয়ে এই নীরবতা ভাঙ্গিয়া কহিল—"মা কালীর পূজো দাও, বাবা নামুনের কামাই নাই গো, রোজ দু'টো তিনটে··· ।"

আর একজন কহিল,—"থানাতে কলেরার ডাক্তোর রইছে, তাকেই আনো না হয়।"

একজন পুরুষ বিষণ্ণ বিজ্ঞতায় ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—"ও কিছু হবে না, ওই যা বলেছে ;—মা-কালী আর মনসার পূজো, আর, আর,···।"

চারিদিকে একটা সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া লোকটা বিভীষিকা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিল।

শ্রোতার দল ভাবটা বজায় রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"আর আর···।"

লোকটা কহিল,—"এই,···।"

তবলচী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় বলিয়া উঠিল,—"বল কেনেরে ছাই···।"

লোকটা কহিল,—"এই যার বাড়ীতে আগে ব্যামো হয়েচেন, তার বাড়ী টো···।"

সকলে আগাইয়া দিল—"তার বাড়ী টো···"

লোকটা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"পুড়িয়ে দিতে হবে,··· ।"

তবলচী কহিল,—"না, তাই হয় ?"

একজন কহিল,—"কি—রে, মজ্‌লি নাকি, ভারি টান দেখি যে!"

বক্তা কহিল,—"উ ছেলে মানুষের কথা ছাড়ান দাও, ও ছাই জানে। নামুনে এসে ওইখানে বাসা গেড়েচেন কিনা, ওই ইসেকপুরে কত ডাক্তোর কত বদ্যি, পূজো আচ্চা। কিছুতেই থামে না—, শেষে ওই ক'রে তবে··· ।"

ভঙ্গি করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে কথাটা শেষ করিল।

একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল—"তাই দাও বাপু, ব্যামোও থামবে আর ওই হারামজাদীও জব্দ হবে, বেলের যেমন দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।"

আর একজন কহিল,—"বাবা ম'লো, ভাই ম'লো দেখেছ এক ফোঁটা জল চোখে আছে? ধন্যি পরাণ যা হোক!" বলিয়া সে গালে হাত দিল।

আর একজন কহিল,—"হারামজাদী ছেনাল—"

সহসা তাহার কথা ছাপাইয়া একটা নূতন স্বর বৈঠকের মাঝে ধ্বনিয়া উঠিল,—"রাখা দাদা, রাখা দাদা!"

যে কথাটা আরম্ভ করিয়াছিল সে এই ডাকটুকুর পরেই বাকীটুকু শেষ করিল,—"এই যে আয় দিদি, বেলে আয়, তোর কথাই বলছিলাম, আহা-হা এত মেমোতা কারু নাই বাপু, বাপ ভাই মলো তা একদিন পেটভরে কাঁদতে পেলে না, পরকে নিয়েই সারা!"

বেলে হাসিয়া কহিল,—"ছেনালের অমনি করণই রে বুন, আপন তেতো পর মিষ্টি, ছেনালের এই কুষ্টি।"

ধরা পড়িয়া মার খাইলেও চোরের কিছু বলিবার থাকে না, সহ্য করিতে হয়; কথাটায় সব চুপ করিয়া রহিল, কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না।

তুবলচী হারা কথাটার মোড় ফিরাইয়া দিল; কহিল—"তোর রাখা দাদা, এখন পিতিমে ভেসজ্জন হয়ে গিয়েছে ওই দেখ্—।" বলিয়া রাখাকে দেখাইয়া দিল।

হারার সহিত বেন্সের সদ্ভাবটা কিছু বেশী, উভয়ে বাল্যসাথী, তাই হারা কথাটা বলিতে সাহস করিল।

বেলে রাখাকে পুনরায় ডাকিল—"রাখা, দাদা, রাখা উঠে আয়।"

রাখা তখনও পড়িয়া বিড়বিড় করিতেছিল।

"ও—মা দিগম্ব—রী—না—চ—গো!
মন তুমি কি চিরজীবী—হা—হা—হা।—"

জলের উপর ছায়া—সে মায়া, তার মূল্য নাই, এখনি সেখানে হাজার চাঁদের মালা,—আবার তখনি মেঘের ছায়ায় থম্‌থমে আঁধার, তা বলিয়া জল হাজার চাঁদের মালাও নয়—থম্‌থমে আঁধারও নয়।

এই জীবগুলিও ঐ জলের মত তরল, নিজস্বহীন। রাখার গানে সকলে হাসিয়া উঠিল,—পুরুষেরা নীরবে, মেয়েরা সশব্দে।

বেলে এবার রাখার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিল,—"এ ছাই না খেলেই নয়? আয় উঠে আয়, পেঁচো তোর পেঁচো···।"

একজন বিরক্তিভরে কথাটা শেষ করিয়া দিল,—"মরেছে। তোর ছেলে মরেছে রাখা—।"

রাখা চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া একবার কাঁদিয়া উঠিল,—"পেঁচো, পেঁচো—উঃ, পেঁচো আমার বড় ভাল ছেলে!" তারপর ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে শুইয়া পড়িল, কয়েক মুহূর্ত পরেই নাক ডাকিতে লাগিল।

বেলে হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—"না, তোর আর ভরসা নাই। তবে না হয় চল তোমরাই কেউ ছেলেটাকে রেখে এস।" বলিয়া সে মজলিসের মুখপানে তাকাইল।

একজন প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল, "লসো তু যেন যাস না বাবা। তোর আবার মাদুলী আছে, তোকে শ্মশানে যেতে নাই।"

মুখরা বেলে হাসিয়া কহিল,—"তা তুও একটা মাদুলি নিলি না

কেনে লসোর মা, যম এলে বলতিস—বাবা আমাকে শ্মশানে যেতে নাই, আমার মাদুলী আছে!"

কথাটায় লসোর মা থ' হইয়া গেল, তারপর সহসা সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আসুক, আসুক, যম তোরও কাছে আসুক।"

বেলে কহিল,—"যম তো আর লসোর বাবা লয় যে, তু যার কাছে যেতে বলবি তারই কাছে যাবে! আর আমার কাছেই যদি আসে তাতেই বা কি?—এ পথ তো সবারই আছে।"

লসোর মা উগ্রচণ্ডার মত রুখিয়া উঠিয়া বেলের চৌদ্দ পুরুষকে ওই পথ ধরাইয়া দিল।

বেলে কিন্তু তবু রাগিল না, হাসিয়া কহিল,—"আমার চৌদ্দ পুরুষ তো ঐ পথেই গিয়েচে লসোর মা,—তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে করব কি বল? আর এখন ঝগড়ার সময়ও লয়। আচ্ছা, তোরা কেউ নিয়ে যেতে না পারিস্, আমার সঙ্গে যেতে তো পারবি?"

তবল্‌চী হারা উঠিয়া কহিল—"চল বেলে, আমি নিয়ে যাব, তু সঙ্গে যাবি চল।"

বেলে পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে কহিল,—"না আমিই নিয়ে যাব, কাজ কি খারাপ ব্যামোর মড়া ছুঁয়ে···।"

মুখরার কণ্ঠে দরদের আভাস মিলিতেছিল। হারা বলিল,—স্বরটা কেমন সঙ্কোচ-জড়ানো,—"মেয়েমানুষকে যে ছেলে নিয়ে যেতে নাই, আঁটকুড়ো দোষ ধরে।"

বেলে হাসিয়া কহিল,—"শির নাই তার শিরঃপীড়ে। বেধবা মেয়ের আবার ছেলে কিরে হারা?"

হারা বলিল,—"কোন দিন তো সাঙা করবি।"

বেলে হাসিল,—"কাকে রে?—তোকে না কি?"

হারার স্বরটা কেমন বন্ধ হইয়া গেল, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সে কহিল,—“না,—না,—তা, তা,…”

বেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিতেই সেটুকুও বন্ধ হইয়া গেল। ওই অত বড় পাথরের মত বুকখানা তীক্ষ্ণ চটুল হাস্যধ্বনিতে যেন সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

বেলে চলিয়া গেল, মজলিস স্তব্ধ চুপ্ চাপ্।

লসোর মা মনের ঝালটা সহসা ঝাড়িয়া ফেলিল,—“দেখ্ লি, দেখ্ লি, বলি দেমাক দেখ্ লি, বোল বচন শুন্ লি।”

যুবতী খুকী কহিল,—“দেখতে ভাল কি না, তাই অত…।”

মেয়েটি মিথ্যা বলে নাই, এই শ্রীহীনা পল্লীর মধ্যে বেলে দেখিতে বেশ ; রং কালোই তবে ওই কালোর মাঝেও বেশ মেঘলা চাঁদনী রাতের মত। কালোর মধ্যে লাবণ্যের আভাস পাওয়া যায়। থাকেও সে বেশ ছিম্-ছাম্। হাতে এক হাত কাঁচের রেশমী চুড়ী, পরনে চলকো পেড়ে পরিষ্কার কাপড়, পরিবার ভঙ্গিটি ভাল ; মাথার চুলও আছে বেশ একরাশ, তাহাতে খোঁপা বা বেলকুঁড়ির বালাই নাই, সাদাসাপটা এলো খোঁপায় বাঁধা ; সর্বোপরি তাহার ছিপ্ ছিপে দীঘল দেহের গঠনভঙ্গিটি চমৎকার, যেন পাথর কুঁদিয়া গড়া।

বেলে বিধবা, সাঙাও করে নাই। লোকে গণি-রাজমিস্ত্রীকে জড়াইয়া কত মন্দ কথা বলে। কিন্তু গোপনে, কারণ গণি রাজের তাঁবে সকলকেই খাটিতে হয় ; আর সেখানে বেলের পূর্ণ অধিকার। সংসারে বেলের ছিল বাপ আর ভাই, তাহারা এ পাড়ার মহামারী আবির্ভাবের প্রথম আক্রমণেই শেষ হইয়াছে।

খুকীর কথা শেষ হইতেই সেই পাকা ছেলেটা কোথায় ছিল,

ভুঁইফোঁড়ের মত গজাইয়া উঠিয়া কহিল,—"আর হারা কেমন পীরিতে পড়েছে, তা দেখলি তোরা? যা—শালা—যা—, বেলের বাবা আর দাদা শ্মশানে থেটে নিয়ে বসে আছে, যাবি আর এঁ্যা—ক'রে শালাকে ধরবে।"

একটা গদগদভাবের মেয়ে ভান করিয়া আঁতকাইয়া উঠিল,—"ও—বা—বা—রে—!"

মেয়ের দল আবার হাসিয়া উঠিল।

ওদিকে পেঁচোর মা কাঁদিতেছিল,—"ও বাবা আমার—রে—"

রাথার বৌ মরা ছেলেটার বুকে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল।

সাত আট বছরের বড় ছেলেটা বসিয়াছিল হতভম্বের মত, কোলের বছর তিনেকের মেয়েটা মায়ের কান্নার সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছিল। ঘরে আর জনমানব নাই, জীবন্তের মধ্যে কয়টা মুরগী ছাইগাদার উপর ঘোঁট পাকাইতেছে।

হারা ও বেলে আসিয়া রাথাদের ঘরে প্রবেশ করিল।

হারা কহিল—"বেলে, আমি তো কোল থেকে নিয়ে আসতে পারব না।"

বেলে ঘরের ভিতরকার ছবিটার দিকে চাহিয়াছিল, চাহিয়াই রহিল, কথা বলিল না। তাহার মনে যেন একটা ঘা লাগিল, তাহার বাপ গিয়াছে, ভাই গিয়াছে, কই তাহার প্রাণে তো এত বেদনার আকুলতা ছিল না!

এ তো কান্না নয়, এ যে প্রাণ বাহির করিবার ব্যর্থ প্রয়াস।

হারা তাহার দৃষ্টি দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আহা—হা মায়ের পরাণ—!"

ঘায়ের উপর আর একটা ঘা লাগিল।

সে তো মা নয়।

বেলে মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল।—"কে জানে তোর মায়ের পরাণ! বাঁজা সাঁজা মানুষ, ওসব বুঝিও না তার কথাও নাই। আচ্ছা তু' থাক আমিই আনচি।"

বলিয়া সে দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতর্কিত বিহ্বল মায়ের বুক হইতে ছেলেটাকে যেন ছোঁ মারিয়া ছিনাইয়া লইয়া একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তানহারা হতভাগিনী বুকখানা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই দুই হাতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে ছেলের জন্য ছুটিয়া আসিল। মাঝ-পথে হারা তাহাকে ধরিল, বলিল,—"আর কেঁদে কি করবি বৌ, ওটা তো গেলই—এখন ও দুটোকে দেখ্; দেখ্, দেখ্, ছোটটা বুঝি ভিরমী গেল...।"

হতভাগিনী ফিরিল, ছেলেটাকে তুলিয়া লইয়া তাহার সেবায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু মুখে তখনও বুকের ব্যথা ক্রন্দনের সুরে ধ্বনিত হইতেছিল।

হারা ফিরিয়া বেলেকে কহিল,—"চল্।"

বেলের চোখ দুইটা তখনও অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

ব্যথিত হারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল—"আহা—হা মায়ের পরাণ।"

বেলে যেন জ্বলিয়া গেল, ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—"বলি আস্‌বি, না ওই মায়ের পরাণ দেখবি?"

দুজনে চলিয়াছিল নীরবে।

শ্মশানে প্রবেশ-মুখে বেলে মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"হারা, মেয়ে-মানুষ এ কাজ কল্লে কি হয় বলছিলি?"

হারা বলিল—"আটকুঁড়ো দোষ ধরে, তা—আমাকে না হয় দে।"

—"আমি যে এতটা নিয়ে এলাম!"

—"তাতে দোষ নাই, তু তো আর শ্মশানে এখনও দিস নাই!"

—"শ্মশানে দিলেই দোষ তা হ'লে?"

—"হ্যাঁ, আর কাল না হয় মা-কালীর চরণামৃত খেয়ে নিস্, তা হ'লে এটুকু নিয়ে আসার দোষও খণ্ডে যাবে। দে—আমাকে এইবার দে।"

বেলে চাঁদের আলোয় ছেলেটার মুখপানে একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া হারার বুকে তুলিয়া দিল, বলিল—"দেখিস্, ছুঁড়ে কি, আছড়ে দিস্ না যেন, বেশ যতন ক'রে নামিয়ে দিস্।"

হারা ছেলেটাকে লইয়া চলিয়া গেল, বেলে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা অশ্রুর বন্যায় বেলের বুক ভাসিয়া গেল।

বেলে মজুরী খাটে,—গণি রাজমিস্ত্রীর কাছে তাহার বাঁধা খাটুনী।

রোজ প্রাতে চলকো পাড় শাড়ী পরিয়া ঝুড়ি মাথায় বেলে খাটিতে যায়,—তাহার কামাই নাই; বাপ, ভাই মরিলেও সে তিনটা দিন বই কামাই করে নাই।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া পরদিন প্রাতে বেলে কিন্তু খাটিতে গেল না।

মনটা কেমন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল, শরীরটাও কেমন ভার; সে সকালে উঠিয়া দাওয়ার উপর ভাম হইয়া বসিয়া রহিল।

পিসতুত বোন পরীর তিন বছরের মেয়ে রাধে একটা কাঠের পুতুল বগলে আসিয়া প্রবীণার মত বেলের পাশে বসিল।

বেলে কহিল,—"কি লো রাধে, মুড়ি পেয়েছিস্?"

রাধে কহিল,—"মাছি, খেলে মুলি কাবে, আমাল খেলে বাল্লো খেলে" —বলিয়া সে ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে বসিল।

'পাকীতে দান কেলে, পাকীতে দান কেলে, খান্না দোব কিছে?'

পরী আসিয়া কহিল,—"এই যে মুখপুড়ী, আমি রাজ্যি খুঁজে মরি। এক কাঠের পুতুল হ'ল ছেলে। মজা দেখবি বেলে।" বলিয়া মেয়েটার হাত

হইতে কাঠের পুতুলটা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাধে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া পুতুলটা কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—"কানিন্ না, কানিন্ না, ও মানিক্ ও মানিক্, ও বাবা, ও বাবা," বলিয়া আদর করিয়া পুতুলটাকে দশটা চুমা খাইল।

মেয়ের বিজ্ঞতার ভাব দেখিয়া—পরী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল; কিন্তু বেলের চোখ দুইটা কাল রাত্রির মতই আবার জ্বলিয়া উঠিল।

মা ও মেয়ে চলিয়া গেল, বেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বাড়ীর বাহির হইল, পথ ধরিল গ্রামের বুড়ীকালীতলার পানে।

মা-বুড়ীকালী বড় জাগ্রত দেবতা। যে যাহা মানত করিয়া কালীতলার বটগাছের ঝুরিতে ঢেলা বাঁধিয়া আসে তাহাই পূরণ হয়; গাছটার ঝুরিতে বোধ হয় লাখ খানেক ঢেলা ঝুলিতেছে। ঢেলার ভারে গাছটাই হয় তো ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি?—লক্ষগুণ মানুষের অপূর্ণ সাধের যদি ওজন থাকিত তবে সে ওই ঢেলাগুলার চেয়েও বেশী হইত।

বেলে ঝুরিতে একটা ভারী ঢেলা বাঁধিতে লাগিল।

কে পিছন হইতে বলিল—"কি মানত করলি বেলে?"

বেলে ঢেলা বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল,—"বুকের রক্ত।"

উৎসুককণ্ঠে আবার প্রশ্ন হইল,—"কিসের তরে লো?"

বেলে ঘুরিয়া দেখিল প্রশ্নকারিণী গ্রামেরই বামুনদের মেয়ে, সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল,—"বলতে নাই ঠাকরুন!"

উৎসুক প্রশ্নকারিণী তাহার যুক্তি খণ্ডিয়া কহিল,—"সে বলতে নাই অপর জাতকে, বামুন আর দেবতা কি ভিন্ন নাকি? বরং লুকুলেই পাপ।"

বেলে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ঘামিয়া উঠিল, বলিল,—"ছেলের তরে ঠাকরুন!"

ঠাকরুন সকরুণ সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলিলেন,—"তা বেশ, বেশ,

অফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ী দুই-ই সমান—শেষ আঁস্তাকুড়ই গতি। ছেলে নইলে আবার ঘর। তা তোর হবে, ধর্মপথে থাকিস্, সব হবে, জানিস্ তো 'ধর্মপথে অধিক রেতে ভাত'।"

বেলের বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল,—তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বহুকষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে কহিল,—"ঠাকরুন?"

—"কি লো?"

বেলে বলিল,—"পেসাদী ফুল দুটো তুলে দাও না মা!"

ঠাকরুন একটি নির্মাল্য কুড়াইয়া লইয়া বেলের হাতে তুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তা সাজা করলি কাকে লো?"

সন্ধ্যার সময় বেলে দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিল, কিসের অভাবের ব্যথায় বেলের ছলছলে জলস্রোতের মত চপল মনটা উদাস হইয়াছিল; সে আকাশের দিকে চাহিয়া অজানা পথের কোন্ অনাগত পথিকের পথ চাহিয়া আছে।

গণি মিস্ত্রী আসিয়া ডাকিল—"বেলে!"

বঞ্চিতের মন কিঞ্চিতেও মানে,—নিঃসঙ্গা বেলে গণির সঙ্গ পাইয়া যেন কিছু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"এস!"

গণি বলিল,—"তবু ভাল, আমি বলি বা ভুলে গেলি।"

বেলে কিছু ম্লান হইয়া গেল, বলিল,—"কাল রেতে পেঁচোকে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম কিনা, গা'টো বেশ ভাল নাই—, মনটোও না; পেঁচোর মা সারারাত সারাদিন সর্বক্ষণ কাঁদচে।"

গণি বলিল,—"আহা—হা মায়ের পরাণ!"

সব চুপ, কথাটা যেন হারাইয়া গেল।

শেষে গণি কথাটার খেই ধরিয়া কহিল,—"ওর যে ওই হবে ওতো জানা কথা, পেঁচোর মায়ের রীত-চরিত তো জানিস্! অধর্মের ধন থাকবে কেনে?"

বেলে ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সত্যি থাকে না?" তাহার মনে পড়িল ঠাকরুনের কথাটা!

গণি উত্তর দিল,—"তাই থাকে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে,—এ শাস্তোরের কথা! তা দেখ্‌লি তো!"

আবার সব চুপ।

সহসা গণি বলিল, "ছাড়ান দে ও কথা। লে একটো বিড়ি খা।"

বেলে কহিল,—"না।"

আবার সব চুপ।

গণি খানিকক্ষণ একাই বিড়ি টানিয়া শেষে জমিল না দেখিয়া উঠিয়া কহিল,—"কাল যাস্।"

বেলে কহিল,—"না।"

বিস্মিত গণি কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রশ্ন করিল,—"না? তোর হ'ল কি বল্ দেখি?" বলিয়া বেলের হাত ধরিয়া টানিল।

বেলে দৃঢ় আকর্ষণে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,—"না, হাত ছাড়।" বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া আবার আকাশ-পাতাল চিন্তা।

কিছুক্ষণ পর গণি কহিল,—"এই শেষ!"

এতক্ষণ গণি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। বেলে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই শান্তকণ্ঠে কহিল,—"বেশ।"

আবার খানিকক্ষণ পর শুনিল, সেদিনের সেই খুকীর গলা—"কি গো কোন্ দিকে?"

গণির গলা পাওয়া গেল,—"তোকেই খুঁজছিলাম।"

খুকী কহিল,—"ও মা—গ, কিসের নাম কি! বলে যে সেই—কালা তোর লাখ ছেনালী, রাধার ঝাঁটা খেলে তখন সুন্দরী হন চন্দ্রাবলী!"

দিন কয় পরে খুকী আসিয়া কহিল,—"কিলো বেলে, বাড়ী থেকে বেরুস্ না, খাটতে যাস্ না, বলি বিবেগী হবি নাকি?"

খুকীর পরনে আধহাত চওড়া হাতী-পাড়াপেড়ে শাড়ী, হাতে একহাত সোনালি রেশ্মি চুড়ি, মাথায় নেবুতেল, নাকে সোনার নাকছাবি, এগুলি গণির দেওয়া নতুন উপহার। গণির কৃপা হইতে তাহার বঞ্চনার সংবাদ বহিয়া আনিলেও বেলে কিন্তু ক্ষুব্ধ হইল না।

তবু সে বাঁকা কথার উত্তর বাঁকা ভাবেই দিল।—"মন তো তাই, বুন আমার সিল্কের শাড়ীখানা আর শাখাবাঁধাটি দেবার লোক পেছি না,—তু লিবি খুকী?"

খুকী ভাবিল, এ ঝাঁঝ বেলের বঞ্চনার ক্ষোভের আঁচ। তাই সে ঝাঁঝটা গায়ে না মাখিয়া মিষ্টি মুখেই জবাব দিল,—"আমারই বলে কে খায় তার ঠিক নাই, পরের নিয়ে করব কি?"

বেলে হাসিল, তাহার সিল্কের শাড়ীখানির উপর বহুজনের লোভের সংবাদ সে জানিত। আর এও জানিত যে, ঐ শাড়ীখানির উপর লোভ হইতেই গণি পাড়ায় লোভনীয়; তাই সে কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিল।

কথাটা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু খুকীর আশ মিটিল না, বেলের ঠোঁটের হাসি মিলাইল না; সহসা বেলের গলার পানে চাহিয়া সে ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "গলায় তোর মাদুলী কিসের লো বেলে? ছেলের তরে নাকি শুনলাম?"

বেলের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে চোরের মত চুপ হইয়া রহিল। খুকী বেশ্ ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"তা বেশ বেশ। আহা তা হোক্।"

বেলে কেমন আবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িল ; সে অনুরূপকণ্ঠে কহিল,—"তাই বল বুন, তাই বল। নইলে আফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ি দুয়েরই আঁস্তাকুড় গতি।"

খুকী এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল—"হবে লো হবে। তা সাঙাই আগে হোক।"

বেলে স্থির দৃষ্টিতে খুকীর দিকে চাহিয়া রহিল, মনে পড়িল—ঠাকরুনও যে সেদিন এই কথাই বলিয়াছিলেন।

খুকী দম লইয়া হাসির গতিটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল—"আ—আমার মনের মাথা খাই—বলি সাঙাতে তোর বাত্থি কি হবে লো—ঢাক্—না—ঢোল্!"

•

বেলের মনে পড়িল একজনকে।

যাইতে কিন্তু বেলের পা উঠিল না, সে দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িল ; যেন মাটির বুকেই মুখ লুকাইতে চাহিল।

খানিকটা কাঁদিয়া বেলে উঠিল, আবার বসিল, আবার উঠিল, আবার বসিল ;—কেমন একটা অস্থিরতায় আকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু শেষে সে পথ ধরিল।

দাওয়া হইতে আঙিনায় নামিয়াছে এমন সময় সেদিনের সেই পাকা পাজী ছেলেটা হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—"বেলে লো!"

সংকল্পের মুখে বাধা পাইয়া বেলে বড় সন্তুষ্ট হইল না ; সে নীরসকণ্ঠে বলিল—"কি ?"

ছেলেটা হুঁকা টানিতে টানিতে ভূমিকা করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল।

হঠাৎ হারা আসিয়া ডাকিল—"বেলে !"

সেই স্বর, সঙ্কোচ—শঙ্কায় মাথামাখি।

ছেলেটা পালাইল।

বেলের কথা ফুটিল না, শুধু যেন সে একটা রুদ্ধ কম্পনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল ; চোখ দুইটা কেমন যেন চক্ চক্ করিতেছিল। কিন্তু সে দৃষ্টির দীপ্তি নয়, জলের উপরে আলোর খেলা।

হারা আবার কহিল,—"বেলে, সত্যি তুই সাঙা করবি ?"

কথাটা হারার—

তবু বেলে কথা বলিল না।

হারা কহিল,—"বেলে, আমি তোকে মাথায় ক'রে রাখ্‌ব।"

হারা আর বলিতে পারিল না, বলিবার সময়ও পাইল না, বেলে কাঁপিতেছিল হারা তাহাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইল।

সহসা বাইরের দরজার আড়াল হইতে পাকা ছেলেটার মুখখানা উঁকি মারিল—সে উলু দিয়া উঠিল। বলিল, "বর বড় না কনে বড় ?" হারা সরোষে ছেলেটাকে তাড়া করিতে গেল কিন্তু বেলে গমনোদ্যত হারাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কহিল,—"না—না—"

• • •

বেলে ও হারাতে সংসার বাঁধিল।

নতুন জীবন, বেলে ও হারার সুখেই কাটিতেছিল।

কিন্তু দীপ্ত দিনের আলোর মাঝখানে আঁধার বাস করে ছায়ার আকারে।

২

রথের মেলা।

বেলে হাসিয়া হাত পাতিয়া বলে,—"আজকে যে রথের মেলা, মেলা দেখব, পয়সা দাও।"

হারা পয়সার বদলে টাকাটা গুঁজিয়া দেয়, বেলে সোহাগের সুখে ঢলিয়া পড়ে।

মেলা হইতে ফিরিয়া হারাকে বলে,—"কই, কি আনলে দেখি ?"

হারা বলে,—"আগে তোমার দেখি !"

বেলে দেখায়—ঝুমঝুমি, বেলফুল, কাঠের ফুল, ঝিনুক, বাটী, হারার ভাত খাইবার জন্য একখানা খাঁদা পাথর।

হারার ঠোঁটের ডগায় সুখের কৌতুক মিলাইয়া যায়,—গুমোটের ছায়া দেখা দেয়।

এবার বেলে বলে,—"তোমার দেখি !"

হারা পুঁটুলিটা আগাইয়া দেয়, খুলিয়া দেখাইবার আগ্রহ তখন আর তাহার নাই; বিভোরা বেলের মনে কিন্তু এ অসন্তোষ ধরাই পড়ে না, আপনার আগ্রহে সে আপনি খুলিয়া দেখে,—মাথার তেল, আয়না, চিরুণী, খোঁপার কাঁটা, চুড়ি, আরও কত কি।

সে জিনিসগুলা ঈষৎ ঠেলিয়া বলে,—"খোকার কই ?"

হারা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"খোকা কই ?"

বেলের অসন্তোষ বাড়িয়া গেল, বলিল—"হবে তো।"

হারা চুপ করিয়া থাকে, একটুক্ষণ পরে উঠিয়া যায়, ভাল লাগে না। সর্বক্ষণ খোকা, খোকা, খোকা !

বেলে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঝুমঝুমিটা নাড়ে, খেলাফুলটা ঘুরাইয়া দেখে, অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া সুর করিয়া ছড়া ধরে,—সে সুর গায়কের কণ্ঠে

ফোটে না, শিল্পীর দক্ষতার সংস্থান হয় না, তাহাতে বাঙলার মাতৃকণ্ঠের চির-নিজস্ব করুণ মধুর একটানা ঘুমভরা স্বর,—

"আয় রে খোকন ঘর আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়;
কাজল নাতায় কাজল শুকায় মায়ের চোখে জল,
বুক ভাসিয়ে ক্ষীরের ধারা ঝরছে অবিরল।"

কর্ম এক কিন্তু কাম্য পৃথক এমন প্রায়ই দেখা যায়, গাছ লাগাইয়া কেহ চায় তার ফুল, কেহ চায় তার ফল; হারা ও বেলের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল, হারা চাহিয়াছিল ফুল, আর বেলে চাহিয়াছিল তার ফল।

এমন মতান্তরে মনান্তরই ঘটিয়া থাকে,—তবে মনের আগুন সহজে বাহিরে আসিতে পায় না; কিন্তু যেদিন আসে সেদিন আগ্নেয়গিরির মতই বিপর্যয় ঘটাইয়া অগ্ন্যুদ্গার করিয়া থাকে,—ঘটিলও তাই।

একদিন কৌতুকের মাত্রা দীর্ঘ করিয়া বেলে ঘাড় দুলাইয়া কহিল,—"তুমি বলু দেখি হ'ল কি? দেখ্‌ব তুমি কেমন?"

হারা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বেলে আজ হারার বিরক্তি গ্রাহ্যই করিল না। পুলকিত হইয়া বলিল,—"সত্যি সত্যি।"

হারা জিজ্ঞাসু-নেত্রে বেলের পানে চাহিল। কোন্ জাদুতে যেন বেলের মুখ-চোখের কৌতুক মিলাইয়া গিয়া লজ্জার অপূর্ব এক মাধুর্য ফুটিয়া উঠিল।

হারা কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিল। মনে হইল বেলে তাহার যেন পর হইয়া গেল।

যে অর্থ সঙ্গীতে অস্পষ্ট, ভঙ্গীতে তাহা যেমন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটে, মনের ভাবও তেমনি কথায় ধরা যায় নাই কিন্তু সে তাহার নীরবতার

মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। বেলেও গম্ভীর হইয়া গেল, কহিল—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

"কার সঙ্গে মারামারি করব?"

বেলে বলিল,—"মারামারি করবে কেনে? মারামারির কথা তো এ নয়, ছেলে হবে সুখের কথা।"

এবার বাঁধ ভাঙ্গিল।

হারা কথার সুরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল,—"না সুখের কথা নয়, গা'টা গদ গদ করচে না আমার! গরীবের আবার ছেলে কেনে রে বাপু?—এ বাজারে খোঁজ এখন জুধ রোজ; মরতেও জায়গা পায় না সব।"

এক মুহূর্তে বেলে বিজলীদীপ্তির মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বাজের মতই হাঁকিয়া উঠিল,—"হারা, বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

বেলের কথাটা সেই মুহূর্তে হারার বড় বাজিল, সারা বুক জুড়িয়া ধিক্কারের সুরে বাজিল, হায় রে নারীর গৃহবাসী পুরুষ!

হারা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল, কিন্তু কিছু কহিতে পারিল না; আবার মাথাটি নত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বেলের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে মনে মনে শতবার বলিল—"ষাট্ ষাট্!" বার বার বুকের মাদুলীটা মাথায় ঠেকাইল।

• •

হারা শুধু বেলের বাড়ী হইতেই চলিয়া গেল না, গ্রাম ছাড়িয়াই কোথায় চলিয়া গেল। একদিন, দুইদিন, ক্রমে মাস চলিয়া গেল তবু সে ফিরিল না। বিরহের দিনে বেদনার ওজনে ধ্যানের গভীরতায় মানুষের উপলব্ধি হয় হারানো ধনের কি মূল্য, কতখানি সাধনার ধন ছিল সে।

হারাকে বেলে বুঝিল সে তাহার কে, তাহার কতখানি জুড়িয়া সে ছিল। ভাতের হাঁড়ি আধখানা খালি, বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে, বিছানা আধখানা খালি পড়িয়া থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না; সে আসিবে এই লইয়া কত কল্পনার জাল বুনিয়া রাত্রি কাটিয়া যায়। অন্তর নিরন্তর বেদনায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

শুধু তাই নয়, সেই পাকা ছেলেটা মধ্যে মধ্যে বুক ফুলাইয়া আসে, হাসে, ছড়া কাটে--

"রাঙ্গা পেড়ে শাড়ী দিব শঙ্খ দিব রাঙা,
সুন্দরী লো কর্ না আমায় তিন নম্বর সাঙা।"

মুখরা বেলে হারার অভাবে কেমন হইয়া গিয়াছিল, নহিলে মুখরা বলিয়া বেলেকে এপাড়ার সকলে ভয় করিত; সে সত্যই কিছু বলিতে পারে না, সহ্য করিয়া যায়।

কতজনে পথে ঘাটে কত কথা বলে, সব সহিতে হয়। মনে হারার অভাব প্রবল হইয়া উঠে, আপন ঘরে কাঁদিয়া সে বুক ভাসায়। থুকী, লসোর মা তাহার দুর্দশায় কত 'আহা' বলে কিন্তু সুরের ফেরে কি বেলের মনের ফেরে কে জানে, সেগুলি 'বাহা' বলিয়াই বেলের মনে হয়। আবার কতজন তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াও বলে,—"আহা কি করবি বল, স্বারে ভাতারে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা।"

মনের সব কথা, সে যত ব্যথারই হউক না কেন, মুখ ফুটিয়া বলা যায় না; বেলে কাঁদিল হারার জন্য কিন্তু বিলাপের মধ্যে মরা বাপ ভাইকে ডাকিয়া কাঁদিল—"ওগো বাবা গো, ওগো দাদা গো—আমাকে সঙ্গে লাও গো।"

পড়শীরা কেহ কহিল—"আহা!" কেহ কহিল,—"দুখ্ কত্তেই তো

আসা মা, কেঁদে কি করবি বল!" খুকী কহিল,—"ঢং!" লসোর মা কহিল, —"বাপ ভাই-এর আজ সগ্ হ'ল!"

ওদিকে সম্বল শেষ হইয়াছে। অনাহার আরম্ভ হইল। এক দিন। দুই দিন।

পেটের জ্বালায় ভাবিয়া চিন্তিয়া বেলে শেষে গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ঠাকরুন, লোক রাখবে? ঝি?"

ঠাকরুন তাহার আপাদমস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, "না।"

সে আবার অন্য দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল; এ ঠাকরুন এক কথায় সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যান না করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এই অবস্থায় তুই কাজ করবি কি ক'রে লো?"

বেলে চুপ করিয়া রহিল।

ঠাকরুন বলিল, "বসে ভাত তো কেউ দেবে না মা, আর তো ক'টা মাস, কোন রকমে চালা, তারপর আসিস্, দেখ্‌ব। হারা ছোঁড়া বুঝি পালিয়েছে?"

বেলের চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

ঠাকরুন কহিলেন, "নরকে ঠাঁই হবে না ছোঁড়ার। তাও বলি আবার, ভগবানের বিচার নাই, আমি কত দেবতাই সাধলাম, তা একটা হ'ল আমার? তা না, যাদের আজ খেতে কাল নেই তাদের ঘরে ছেলে বেঙাচির মত কিল্ বিল্ করছে। গরীবের আবার ছেলে কেনে রে বাপু? কথাতেই আছে।

বড় লোকের বিটি বেটা
গরীবের ও পেটের কাঁটা!

নাই নাস্তিকের ঘর
সকাল বেলায় দুধ রে,
রোগ ব'লে তার ওষুদ রে।

আর রোজগার করতে শিখলেই তো মা বাপের সঙ্গে ভিন্ন-ভাতে পাড়া-পড়শী।"

পুড়িবার জন্য মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আগুনের আঁচের আভাসেই দূরে সরিয়া যায়। বেলে আর শুনিতে পারিল না, দ্রুতপদে একরূপ ছুটিয়াই পলাইল।

অনাহারে কয়টা দিন মানুষ থাকিতে পারে? অবশেষে বেলে সকালে উঠিয়া পুরানো ঝুড়িটা মাথায় করিয়া বাহির হইল। কুচকাওয়াজের পায়ের আওয়াজের মত মেয়ের দলের কোপাগুলা একসঙ্গে পড়িতেছে খট্ খট্ খট্ খট্, ঐ আওয়াজের তালে তালে সমবেত কণ্ঠেই গান চলিতেছে।

"কালা বিনে হলাম কাল,
কালোর গুণ আর বলব কত!"

সাথে সাথে কর্নির আওয়াজ ঠুন্-ঠুন্, ঠন্-ঠন্।

বেলে আসিয়া তাহাদের একপাশে দাঁড়াইল। সকলের আগে খুকীর নজর পড়িয়াছিল, তাহার দিকে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "রাজ, রাজ, রাণী এসেছে গো, রাণী এসেছে।"

পুণি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বেলে। হাসিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া কানেগোঁজা পোড়া বিড়িটা ধরাইয়া কহিল, "কোন্ রাণী রে কোন রাণী, চারু, না ছুতো, না মেথ্?"

গান ছাড়িয়া মেয়ের দল হাসিয়া উঠিল।

খুকী খোঁচা দিয়া কহিল, “না গো না, রাজরাণী গো, রাজরাণী!”

মেয়ের দল এবার হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বেলের পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতেছিল, মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে।

গণি চট্ করিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা ছোট টিনের আরসী বাহির করিয়া বেলের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, “তুই বল্ কেনে ভাই, এই রূপে কি রাণী হয়?”

বেলে দেখিল তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা যেন ক্রমাগত লম্বা হইয়া যাইতেছে। সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ইটের গাদার উপর পড়িয়া গেল।

বেলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল সে আপনার ঘরে।

শরীরটা কত হাল্কা, কিন্তু দুর্বল, সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা।

সদু দাই কহিল, “আঃ, চেতন হয়েছে বাঁচ্লাম!...”

দাইকে দেখিয়া বেলের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

দাই বলিল, “ওই কাজই কি করে মা, ন'মাস দশ মাসে কি খাটুনি খাটতে যায় লোকে? কি হ'ল বল্ দেখি ইটের উপর প'ড়ে? আজ দু'দিন পরে চেতন হ'ল।”

বেলের বুকের স্পন্দন দ্রুত হইয়া গেল, হ্যাঁ—তাই তো দেহখানাও যে কত হাল্কা..., বেলে কোলের কাছে হাত বাড়াইল।

কই? কই? সে কাঁদেই বা কই? আর্তস্বরে বেলে কহিল, “দাই-মা, আমার ছেলে?”

দাই কহিল, “পেটের কাঁটা খসেছে, তুই বাঁচলি এই ঢের, আবার হবে, ভয় কি? খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে।”

এই বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ বেলে জানিত, সে অস্ফুট আর্তনাদে আবার জ্ঞান হারাইল।

প্রায় মাসখানেক পর।

দু'জন পথিক সন্ধ্যার মুখে গ্রামের দিকে আসিতেছিল, একজনের পিঠে একটা বোঁচ্‌কা, হাতে একটা রঙীন কাগজের বাক্স, তাহার গতিটা কিছু অস্থির, যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অপর জন কহিল,—"তা হ'লে তো খুব ভাল বলতে হবে, মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা রোজগার!"

সে বলিল,—"দেখ কেনে, খেয়েছি দিয়েছি, আর পাঁচ মাসে তা শ' খানেক জমেছে—। কলে কি পয়সার অভাব ভাই?"

অপর জন বলিল,—"আমিও এবার সঙ্গে যাব তোমার। কবে যাবে তুমি?"

সে বলিল,—"যেতে আমার দেরি আছে, একখানা ঘর তুলব তার আগে আর যাচ্ছি না!"

অপর জন বলিল,—"তখনি যাব না হয়, কিন্তু কি ক'রে খবর পাব আমি? পাঁচকোশ তফাতে থাকি।"

সে বলিল,—"খবর নিয়ো।"

অপরজন বলিল,—"তোমার তো এই গাঁয়ে বাড়ী?—কি নাম ভাই—খোঁজ নেব।"

সে কহিল,—"হারা বাউড়ী।" এই বলিয়া সে পথ ভাঙ্গিল।

অপরজন বলিল,—"পথটা ভাল নয় হে, টুকুচে ঘুরেই যাবে চল।"

হারা কহিল,—"কেনে?" সে একটু হাসিল।

অপরজন কহিল,—"কি জানি! কি বলে সব ভাই এ ধারের লোক!"

হারা কহিল,—"তা হোক, এই ত সন্ধ্যেবেলা।" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার মন আর মানিতেছিল না। আজ পাঁচমাস পর সে ফিরিতেছে, বেলেকে দেখিবে, আর, আর একখানি কচি মুখ!

দীর্ঘ দিনের অদর্শনে মিলনের তৃষ্ণায় তাহার ভ্রম কাটিয়াছে, সে বুঝিয়াছে সে ও বেলের মাঝে যাহাকে কঠিন বাধা ভাবিয়াছিল সে বাধা নয়, সে কোমল ফুলের মালা। দুটি মিলনোন্মুখ হিয়ার মধ্যস্থলে চিরদিন তার বাস।

শ্মশানের পা ঘেঁষিয়া পথ।

সন্ধ্যার আব্ছায়ায় স্পষ্ট না হউক তবু সব দেখা যায়,—ঐ দুইটা ন্যাড়া তালগাছ। কয়টা পোড়া কাট, ঐ কয়টা কুকুর—কি শেয়াল, ঐ একটা—ওটা কি? মানুষের মত?

হারার সর্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম ভয়টা কাটিতেই হারা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই হাসিল। মনে পড়িল কতদিন রাত্রে এই পথ ধরিয়া গিয়াছে, কতদিন রাত্রে শ্মশানের বুকে আসিয়াছে।

শ্মশানে আসার কথা মনে হইতেই হারার মনে পড়িল একটা রাত্রির কথা—রাধার ছেলেটা বুকে বেলে ও সে!

সহসা কথার গুঞ্জন কানে আসিল, ওরে আমার ধন ছেলে, এই পথে ব'সে কাঁদছিলে—

তাহা হইলে মানুষই তো!

একটা অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে হারা শ্মশানের বুকে চলিল,—দেখিল, ছিন্নবস্ত্র, রুক্ষকেশ, শীর্ণ কঙ্কালাবশেষা এক যেন মেয়ে একটা সদ্য-

মরা ছেলেকে শত আদরে অজস্র চুম্বনে যেন তাহার অভিষেক করিতেছে আর গাহিতেছে,—

মা মা বলে ডাকছিলে, গায়ে ধূলো মাখছিলে,—

সন্ধ্যার ম্লান আলো তখনও সম্মুখে ঝিকিমিকি করিতেছিল। হারা হেঁট হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গেল, হাত হইতে কাগজের বাক্সটা পড়িয়া ডালা খুলিয়া গড়াইয়া পড়িল,—রঙীন ছিটের কয়টা ছোট জামা, জরির টুপী, ঝুমঝুমি, বাঁশী, কয়গাছা রূপার চুড়ি, কোমরের বিছে, অমনি আর কি কি। হারা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বেলে বেলে!"

জীবন্তের রাজ্যের আহ্বান বুঝি মরণের দ্বারপ্রান্তবাসিনী নারীটির কানে পৌঁছিল না, সে তখনও আপন মনেই গাহিতেছিল—

"সে যদি তোমার মা হত,
ধূলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত—
তা হ'লে তো আমার বুকে আসতে না
মা মা ব'লে হাস্‌তে না।"

চব্বিশে ডিসেম্বর

অর্ধসমাপ্ত গল্পটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, কাল রাত্রি একটার পর শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়ায় গল্পটা আর শেষ হয় নাই। প্রশান্ত সকালে উঠিয়াই খাতা কলম লইয়া বসিল। কয়েক লাইন লিখিয়াছে এমন সময় বাধা পড়িল। সম্মুখেই রাস্তার উপর পিছনের ভাড়াটিয়ার ছেলেতে ও মেয়েতে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিয়াছে।

ছোট একটা টিনের বাড়ী; পাকা দেওয়ালের উপর টিনের ছাউনি। এই বাড়ীর রাস্তার উপরের ঘরখানি লইয়া প্রশান্ত বাস করে। ভিতরের অংশটা পনেরো টাকায় ভাড়া লইয়া বাস করেন একটি পরিবার। ওই পরিবারেরই ছেলে ও মেয়ে। মেয়েটি বড়। ছেলেটি ছোট, বোধহয় বৎসর-পাঁচেক বয়স হইবে।

মেয়েটি তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল আর ছেলেটি দুই হাতের মুঠায় দু'গোছা চুল ধরিয়া প্রাণপণে টানিতেছিল। প্রশান্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দু'জনকে ছাড়াইয়া দিয়া বলিল, ছি খোকা, এমনি ক'রে দিদিকে মারতে আছে? বড়দিদি, গুরুজন···

—আমি ছাড়ব না। ও কেন আমায় হাতী বল্লে!

প্রশান্ত কথাটার অর্থ বিশেষ বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না—শুধু খোকাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়েই হাসিয়া বলিল, ছি খুকী, ভাইকে কি হাতী বলতে হয়? আর কোথায় খোকা হাতীর মত দেখ্‌তে? দেখ্‌ত খোকন কেমন সুন্দর!

খুকী আপনার চুলগুলি ঠিক করিয়া লইতেছিল, চোখে যন্ত্রণায় জল

তখনও ছল ছল করিতেছে, তবুও সে সলজ্জ হাসি-মুখে বলিল, ওকে ত হাতী বলি নি আমি।

খোকা গর্জন করিয়া উঠিল, বলিস্ নি পোড়ারমুখী, তুই বল্লি নি মটর কিনে দেবে বাবা না হাতী কিনে দেবে!

খুকী লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া রহিল, খোকা গর্জন করিতে করিতে বলিল—আমি বললাম—আজ বড়দিনে বাবা আমাকে মোটর কিনে দেবে, তাইতে আমাকে ও বল্লে। বল্লি নি তুই?

বাড়ীর ভিতর হইতে ওদের মায়ের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—খুকী—অ—খুকী,—ঝগড়া করছিস বুঝি তোরা ওখানে।

খুকী পলাইয়া বাঁচিল, খোকা বলিল—জানেন ও ভারি দুষ্টু, বাবা আমায় মটোর কিনে দেবেন কিনা—তাই হিংসে হয়েছে ওর।

প্রশান্তের মনে পড়িয়া গেল আজ চব্বিশে ডিসেম্বর। খৃষ্টমাসের সন্ধ্যা আজই।

খোকা বলিল, আমি ত খেল্‌না মোটরকার চেয়েছি, সে আর কত দাম! বাবারও অনেক টাকা আছে।

বাড়ীর ভিতর হইতে একবার খুকী ডাকিল, মণ্টু, মণ্টু—মা ডাকছেন তোমায়, শুনে যাও।

মণ্টু প্রশান্তের হাত ধরিয়া বলিল—আসুন না কার দোষ মাকে বলে দেবেন।

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, যাও তুমি, ভেতরে যাও না, মাকে সব বলবে তুমি, তা হ'লে আর কিছু বলবেন না তোমায়। খোকার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, সে প্রশান্তের হাত ছাড়িয়া গট্ গট্ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আপনার মনেই বলিতেছিল, আমাকেই মারবে খালি, আমাকে মারবে! কেন মারবে আমায়?

রাস্তায় একখানি বড় বাড়ীর ছায়ার কোলে এক ফালি রৌদ্র ক্রমশঃ অতি মন্দ গতিতে আকারে বাড়িতেছিল, প্রশান্ত সেই রৌদ্রটুকুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। লেখার সূত্রটা তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে ভাবিতেছিল আজিকার সন্ধ্যাটার কথা—পৃথিবী জুড়িয়া আজ মহোৎসব। অন্যমনস্কভাবে সে পকেটে হাত পুরিয়া 'মনিব্যাগটি' বাহির করিল। খুলিয়া দেখিল এক টাকা কয়েক আনা অবশিষ্ট আছে। লেখাটা শেষ করিতে পারিলে হয়ত কিছু টাকা আসিবে। সে এদিক হইতে ওদিক পায়চারি আরম্ভ করিল। রাস্তার মোড়ে সারি সারি বড় বাড়ী। একটা বাড়ীর সামনের ঘরখানার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক বসিয়া কি আলোচনা করিতেছিল, তাহার কিছুখানি প্রশান্ত শুনিতে পাইল—তিনটে ডালি দিলেই হবে। যে বাজার! অপর একজন বলিলেন—বাজার বললে চলবে কেন? যাদের দেবে না, তাদের কাছেও ত' যেতে হবে এর পর। তখন নানান অসুবিধে করবে বেটারা, বুঝলে!

একটা ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া চলিতেছিল—কা—বলী বেদানা, কমলা লেবু—। পাশের বাড়ীতে একখানা মোটরে মোট-ঘাট বোঝাই হইতেছিল। বোধ হয় সপরিবারে বড়দিনের বন্ধে বেড়াইতে চলিয়াছেন।

প্রশান্ত কমলালেবুওয়ালাকে প্রশ্ন করিল, কি দর?

—পঁচিশঠো, বাবু।

প্রশান্ত বলিল, দো আনেকা দেও ত ভাই।

ফিরিওয়ালা তিনটি লেবু প্রশান্তের হাতে তুলিয়া দিল।

কি? লেবু কিন্‌ছেন? কি দর?

প্রশান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল—তাহারই বাড়ীর ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকটি। ভদ্রলোকের বাঁ হাতে একটা তরকারী বোঝায় থলে—একটা আঙ্গুলে ঝুলোনো একটা ইলিশ মাছ, গামছায় বাঁধা কতকগুলা জিনিস ডান কাঁধে

ফেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন। প্রশান্তের সহিত চোখাচোখি হইতেই ভদ্রলোক ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বড়দিনের বাজার আজ, তাই উমদা রকমের একটু—। তা আপনিও ত' দেখছি সওদা ক'রে বসেছেন। কি দর হে—রূপেয়ামে কয়ঠো ? ভদ্রলোক থলি নামাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে লেবু বাছিতে বসিলেন। প্রশান্ত বুঝিল, এখন আর ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিয়া লাভ নাই। সে ফিরিল। মনে মনে সে বার বার গল্পটার ছিন্ন সূত্র জোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মন কিছুতেই গল্পের আখ্যান-কল্পনায় নিবিষ্ট হইতে পারিতেছিল না।

মনের মধ্যে কেবল মাত্র একটি কথা জাগিতেছিল—উনিশ শত চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে এক মহামানবের করুণায় তাঁহার তপস্যায় ধরণী ধন্য হইয়াছিল। তাহার চিন্তা আবার ছিন্ন হইয়া গেল। নিজের বাসার সম্মুখে তখন সে আসিয়া পড়িয়াছে।—বাড়ীর মধ্যে একটা কোলাহল উঠিতেছিল। বাড়ীর গৃহিণী আর্তস্বরে বলিতেছিলেন—উঃ মরেছি রে, ছাড় ছাড় হতভাগা, ছাড় বলছি!

খুকীর গলা শোনা গেল—ছাড় মণ্টু। ছাড়, মাকে ফেলে দিলে তুমি, ছি! ছেড়ে দাও বলছি।

প্রশান্ত বুঝিল বিদ্রোহী মণ্টু এখনও দমিত হয় নাই। তাহার পরই দুপ্ দাপ্ চট্ চট্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বিদ্রোহীর শাস্তি হইতেছে তাহাতে প্রশান্তের সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এতটুকু কাতরধ্বনি শোনা গেল না। মা বলিতেছিলেন, তেজ দেখ দেখি ছেলের, চোখে এক ফোঁটা জল বেরুল না! খুনে হবি তুই—আমার কপালে।

প্রশান্ত তক্তপোশের উপর বসিয়া নেবু ছাড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সহসা কি তাহার মনে হইল, সে খাতা কলম গুটাইয়া ফেলিয়া দেবদারু কাঠের বুক-কেসটা হইতে বাইবেল খানা খুলিয়া বসিল। মনে

মনে পড়িতে পড়িতে তাহার কণ্ঠস্বর স্ফুট হইয়া উঠিল—হ্যাট হোলি থিঙ্গ হুইচ্ শ্যাল্ বি বর্ন অব্ দী, শ্যাল্ বি কল্ড্ দি সন্ অব্ গড। সে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাহার পর শ্রদ্ধা নিবেদন করিল সমগ্র খৃষ্টান জাতিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল জন্মাষ্টমীর কথা—বুদ্ধপূর্ণিমার কথা, সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ পর সে একটু হাসিল—হায় রে সাম্প্রদায়িকতা। আবার সে মনে মনে মহাপুরুষকে প্রণাম করিল, এবং সে স্থির করিল তাঁহার স্মৃতিপূজার এই স্মরণীয় সন্ধ্যা ও মহাপর্বদিন কেমন করিয়া এই মহাজাতি উদ্‌যাপন করে, সে প্রত্যক্ষ করিবে। বাস্তবিক সে কখনও এই উৎসব ভাল করিয়া দেখে নাই। কখনও বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, এখানে থাকিলেও তাহার চিন্তাভারগ্রস্ত মনের রুদ্ধ দ্বারে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া দিনটি তাহার অজ্ঞাতসারেই কাটিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তেল মাখিতে বসিল। বাড়ীর ভিতরের পরিবারটির মধ্যে তখন হাস্য আলোচনা চলিতেছিল। গৃহিণী বলিতেছিলেন—মণ্টুর গায়ে কিন্তু খুব জোর হবে বাপু; আমায় ফেলে দিলে গো।

খুকীর গলা পাওয়া গেল—সে বেশ পাকা গিন্নির মতই বলিতেছিল—হাতের পায়ের গুলিগুলো দেখেছ মা—যেন লোহার মত শক্ত! মা ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ও কি ক'রে মাছগুলো কুটছিস্। আমার মাথা খেয়ে—ও, কি হচ্ছে—এত বড় মেয়ে—কোন কাজ যদি শিখেছে। আমায় সেই মাছ নাড়ালে তবে ছাড়লে ত!……ও আবার কি হচ্ছে, তোমায় মস্‌লা পিষ্‌তে কে ডাকলে বল দেখি? পুরুষ মানুষ হ'য়ে— রাখ রাখ, তুমি রাখ।

এবারকার বক্তা স্বয়ং কর্তা—কলমই-বা তোমায় একটু সাহায্য। কলম পেষা আর মসলা পেষা প্রায় এক—বলিয়া আপন রসিকতায়

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিন্নী বলিলেন—তার চেয়ে একটা কাজ কর দেখি—আমার সত্যি উপকার হবে।

—কি, হুকুম করুন।

—নিজেও নেয়ে ফেল—মণ্টুটাকেও একটু সাবান দিয়ে পরিষ্কার করো দেখি। এই ষণ্ডা ছেলেকে শীতের দিনে নাইয়ে দিতে যা নাকাল আমার হয়। প্রশান্ত তেল মাখিয়াও বসিয়াছিল,—ভাবিতেছিল টাকার কথা। লেখাটা আজ শেষ হইল না—অথচ টাকারও প্রয়োজন; একটা ফাউণ্টেন পেন কিনিবার বড় সাধ—তাহা ছাড়া কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলেই ত খরচ।

ওপাশে আবার কথা আরম্ভ হইল। গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁগো, দাড়ি কামালে না? ওই ছিরি নিয়ে তুমি যাবে নাকি?

কর্তা বলিলেন—কেন? তোমার সঙ্গে মানাবে না বলছ? গৃহিণী উত্তর দিলেন—মানাবেই না ত। দাঁড়াও না—সাজ গোজ করি, তখন দেখো। কর্তা বলিলেন—খুকী, আন্‌ত আমার ক্ষুরখানা—আর সেই আয়না ভাঙ্গাখানা। হ্যাঁ, সাবানটা কোথায় আছে তোমার? একটু না নিলে—যা শক্ত দাড়ি।

আবার সব নীরব। প্রশান্তের মনে পড়িয়া গেল—সারকুলার রোডে একজনের কাছে তিন টাকা পাওনা আছে। তাহার শীতের ভয় কাটিয়া গেল, গামছা কাঁধে সে উঠিয়া পড়িল।

বাড়ীর ভিতরে পরিবারটির মধ্যে কথা-বার্তা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।—এই মণ্টু, মণ্টু! গায়ের জামা খুলে ফেল্—নেয়ে ফেল্ তোর বাপের সঙ্গে। মণ্টু আরম্ভ করিল—দিদি!—দিদি বুঝি নাইবে না? আমি এই শীতে—

—ওরে আজ আমরা বড়দিন দেখতে যাব যে……। সাবান টাবান মেখে ফর্সা হয়ে নে। দেখবি—সায়েবদের ছেলেরা কত সুন্দর।

—হ্যাঁ বাবা—সত্যি? বল না—হ্যাঁ বাবা।

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এই মণ্টু! কাছে যেয়ো না, কাছে যেয়ো না—হাতে ক্ষুর রয়েছে দেখছ না।

প্রশান্ত হুড়হুড় করিয়া মাথায় জল ঢালিতে শুরু করিল। খুকী ভিতর হইতে বলিল—বেশী জল খরচ করবেন না আপনি। বাহিরে এই কল ও চৌবাচ্চাটি উভয় ভাড়াটিয়ার সরকারী। মণ্টু লাটিম ও লেত্তি সুতা হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমরা সকলে আজ সাবান মাখব কিনা।

প্রশান্ত স্নান করিতে করিতেই হাসিয়া বলিল—তাই নাকি!

মণ্টু বলিল—হ্যাঁ, জানেন, আজ বড়দিন। বাবা আমায় একটা মোটরকার কিনে দেবেন—দম দিলেই বোঁ বোঁ ক'রে চলবে সেটা জানেন, এমনি চাবি আছে একটা—সেইটে দিয়ে দম দেয়।

প্রশান্ত বলিল—তাই নাকি? কিন্তু তুমি বড়দিনের গল্প জান? এর নাম ত বড়দিন নয়, এর নাম……

মণ্টু বলিল—আপনি কিস্যু জানেন না। বলিয়াই সে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। প্রশান্ত একটু হাসিল। বাড়ীর ভিতরে তখন রান্না-ছোঁকার শব্দ উঠিতেছিল। গৃহিণী বলিলেন—আমার রান্না প্রায় হয়ে গেল। শিগ্‌গির শিগ্‌গির নাও তোমরা। কর্তা বলিলেন—হয়ে গেল এর মধ্যেই?

—এক তরকারী, ভাত আর মাছের ঝোল, আর কিছু না! সমস্ত দিনটা বুঝি রান্নাঘরে বসে থাকবো? ও সব হবে রাত্রে। অনেক ঘুরব কিন্তু! চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল! সন্ধ্যা বেলায় নিউ মার্কেট দেখে বাড়ী ফিরব।

কর্তা বলিলেন—বাঃ—ট্রাম বাসেই আজ ছ'টাকা—তাহ'লে। মণ্টু বলিল—আমায় কিন্তু একটা মোটরকার কিনে দিতে হবে বাবা। কর্তা

বলিলেন—ছেলেমেয়ে দু'টোর জন্যে একটা ক'রে গরম জামা কিনে আনা যাবে, বুঝেছ ? তুমি সঙ্গে যাচ্ছ—নিজে পছন্দ ক'রে নিতে পারবে। গৃহিণী বলিলেন—তোমার নিজের জামা কেনো বাপু আগে। কর্ত্তা বলিলেন—টাকা কোথায় গো—তোমারও ত কিনতে হবে। গৃহিণী নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন—আজ তুমি কি গায়ে দিয়ে বেরুবে বল দেখি ? দেখ, এক কাজ করলে হয় না ? আমাদের বাইরের ওই প্রশান্তবাবুর একটা জামা আনিয়ে নিলে হয় না, ওর কিন্তু অনেক জামাটামা আছে। থাকে টিনের ঘরে কিন্তু সখ খুব আছে ওর। যা ত খুকী—শোন আমার কাছে শোন—বলবি—। আর কথা শোনা গেল না, প্রশান্ত ততক্ষণ কাপড় ছাড়িয়া বাক্স হইতে জামাই বাহির করিতেছিল। ভাল ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটা বাহির করিয়া সে পৃথক করিয়া রাখিল, নিজের জন্য একটা লংক্লথের পাঞ্জাবী বাহির করিল। খুকী আসিয়া ডাকিল—কাকাবাবু! সে কিছু বলিবার পূর্বেই প্রশান্ত ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটা খুকীর হাতে দিল। আজিকার এই নূতন সম্বোধন শুনিয়া তাহার হাসি পাইল, উহারা কখনও ত কাকাবাবু বলিয়া ডাকে না। খুকী চলিয়া গেল—সেও পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, হোটেলে খাইয়া বন্ধুর উদ্দেশ্যে যাইবে সে।

প্রশান্তের যাত্রা বোধকরি ভালই ছিল। টাকা তিনটি সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল। বন্ধু বলিল—চল না 'বিজয়া' দেখে আসি। আমরা যাচ্ছি। ভাদুড়ী মশায় নাকি খুব ভাল অভিনয় করছেন। প্রশান্ত বলিল—না। কাজ আছে আমার একটু। বন্ধু বলিল—আজ আবার কাজ কি হে ? চল চল। আচ্ছা, আচ্ছা, জোড়হাত করতে হবে না। যাচ্ছ ? আচ্ছা—উইশ্ ইউ এ হ্যাপী ক্রীস্টমাস।

চিড়িয়াখানার ফটকে আসিয়া প্রশান্ত দেখিল গাড়ী, মোটর, রিক্সায় রাস্তার দুই পাশ ভরিয়া গিয়াছে। প্রবেশদ্বারে জনতার আর শেষ হয় না। প্রবেশ ও বহির্গমনের বিরাম নাই। বিচিত্রবেশা নারী, সুসজ্জিত পুরুষ, সজীব আনন্দের মত হাসিমাখা শিশুমুখ যেন রূপের হাট খুলিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, খোট্টা, গুর্খা, মান্দ্রাজী, ইউরোপীয়, চীনা, জাপানী, কোন জাতি বাদ নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি যেন মিলিয়া একাকার হইয়া গেছে। এটুকু প্রশান্তের বড় ভাল লাগিল।

এ পাশে সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ-তোরণে সশস্ত্র প্রহরী সামরিক প্রথায় খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে কয়জন অশ্বারোহী প্রহরী। প্রাসাদের উপর সাম্রাজ্যের পতাকা উড়িতেছে। কয়জন ইউরোপীয় অট্টহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া টলিতে টলিতে কয়টি নারীকে লইয়া চিড়িয়াখানা হইতে বাহির হইয়া আসিল। মেয়েগুলিরও পা টলিতেছে। প্রশান্তের মনে আঘাত লাগিল। শুধু ওই মত্ত পুরুষ নারী কয়টিই নয়—তাহার মনে হইল সমগ্র জনতাই মত্ত—উৎসবের নেশায় মত্ত—এত বড় পবিত্র দিনের স্মৃতির আলো কাহারও মনের কোণে জ্বলিতেছে বলিয়া ত মনে হইল না।

পিছনের জনতার ঠেলায় সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া চলিল বর্ধমান হাউসে, বাঘ সিংহের পিঁজরার কাছে। এই বিক্রমশালী পশুগুলিই এখানকার একমাত্র বিস্ময়। দূর হইতেই ঘন ঘন বন্দী বাঘের গর্জন শোনা যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিংহও গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীখানার চারিপাশে লোকের সংখ্যা করা যায় না। চলমান জনস্রোতের গতি এখানে অতি মন্থর। সবাই সবিস্ময়ে এখানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে। পিঞ্জরাবদ্ধ বীর্যবান পশুর সদম্ভ পরিক্রমণের বিরাম নাই, মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া উগ্র ভঙ্গীতে, স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখের জনতার দিকে চায়, আবার পরিক্রমণ আরম্ভ করে। প্রশান্ত একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল,

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল মানুষ পশুশক্তিকে শুধু ভয়ই করে না, শ্রদ্ধাও করে—তাহারই পদানত হইয়া সে এখনও থাকিতে চায়। একথা আজ মনে করিয়া সে যেন কেমন বিষণ্ণ উদাসীন হইয়া উঠিল। সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া সে একটা ময়দানে বসিয়া পড়িল। সম্মুখেই অনাবৃত একটা ঘেরা জায়গায় দুইটা জিরাফ লম্বা ঘাড় বাড়াইয়া দর্শকদের হাত হইতে খাবার খাইয়া ফিরিতেছিল। একটি তরুণী জিরাফের ছবি আঁকিতেছিল। দুইজন সৈনিক কালো পোষাকের উপর ছড়ির তাল দিতে দিতে শিষ কাটিতে কাটিতে চলিয়াছিল। একজন তরুণীটিকে দেখাইয়া কি যেন বলিতেছিল। অবরুদ্ধ পশুরাজ্যের চারিদিকে আনন্দ-চঞ্চল মানুষের উল্লাস-হাস্য মুহুর্মুহু ফাটিয়া পড়িতেছিল। প্রশান্ত চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার মনে আজ উল্লাস জাগিল না। উপভোগের সঙ্গী থাকিলে হয়ত এমন হইত না। একবার মনে হইল মণ্টুদের অনুসন্ধান করিয়া দেখে, আবার সে খানিকটা ঘুরিল। রেপ্‌টাইল হাউসের কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। একটি সামান্য অবস্থার ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়াছেন। মহিলাটি পরিচ্ছন্ন লালপেড়ে শাড়ীখানি হাল ফেসানে ঘুরাইয়া পরিয়াছেন—চুলের বিন্যাসও আধুনিক, পায়ে একটা পুরানো কম দামী স্যাণ্ডেল, কোনমতে সেটাকে টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটি সোৎসাহে বকিতে বকিতে যাইতেছিল। প্রশান্ত ইহাদের মধ্যেই প্রতিবেশী পরিবারটিকে দেখিতে পাইল। সে আর অপেক্ষা করিল না। সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। খিদিরপুরের পুলের ঐ পাশেই সে এস্‌প্লানেডগামী একখানা ট্রামে চড়িয়া পড়িল। ট্রামে বসিবার স্থান নাই—আসন দুই-সারির মধ্যবর্তী স্থানটুকুও যাত্রীতে পরিপূর্ণ। প্রশান্ত কোনরূপে পিছনের স্থানটুকুর মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইল। ট্রাম পুল পার হইতেই প্রশান্তের দৃষ্টিপথে পড়িল রেসকোর্স। রেস-কোর্সের চারিদিকে—ভিতরে, বাহিরে মানুষ—মানুষ আর মানুষ। খেলা

তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জনতা বিশাল ময়দানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে-ছিল। রেসকোর্সের মধ্যে ওদিক হইতেও বড় বড় সুসজ্জিত মোটর আসিয়া আপন আপন মহামান্য মালিককে লইয়া রেসকোর্স হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে! এদিকে যাত্রীদের অপেক্ষায় সারি সারি বাস ট্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে। কয়জন মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী ও জন-দুই ইংরেজ ওই যাত্রীপূর্ণ ট্রাম-টাতেই ঠেলিয়া গুঁজিয়া চড়িয়া পড়িল। সকলেই আপন আপন কথাবার্তাতে বিভোর। বাঙ্গালীবাবু কয়টি কোলাহল বাধাইয়া তুলিয়াছিল—একজন বলিল—এক পাশের গোঁফ কামিয়ে ফেলব আমি, রেস খেলে খেলে আমার চুল পেকে গেল। বড়দিনের খরচ চিরদিনই শালা, এই রেস থেকে তুলি আমি।

অপর একজন বলিয়া উঠিল—ভুটানের মহারাজা—ভুটানের মহারাজা! প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বক্তা বলিল—দেখলি—দেখলি বডিগার্ডদের পোষাক! দেখলি টুপিটার বাহার! দেখেছিস—মিশ্ কালো চোখের মত টুপীটার ওপর পালকং কেমন মানিয়েছে বল ত!

ট্রামের জনতার কথোপকথন কমিয়া গেল—সকলেই চাহিয়াছিল ওই মোটরখানির দিকে। এই সময় প্রশান্তের কানে গেল মৃদু কয়টি কথায় ইংরাজ দুইটির পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল।

—প্লেস অর উইন্?

—উইন্ আই প্রেফার।

ট্রামের মধ্যে আবার কথোপকথন আরম্ভ হইয়া গেল। স্পষ্ট কোন কথা শোনা যায় না—তবে সবই যেন রেসের হারজিত লইয়া কথা। রেড রোডের ক্রসিং-এর কিছু দূরে ট্রাম থামিয়া গেল, সম্মুখে সারি সারি ট্রাম দাঁড়াইয়া আছে। দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ মোটর। গোধূলি লগ্নে সুসজ্জিত

নরনারীর সজ্জার বিচিত্র বর্ণ বহুগুণে সুমনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। ফুলের মত ইউরোপীয় ছেলে-মেয়েগুলির চঞ্চলতার শেষ নাই। নানা রংএর বেলুন লইয়া তাহারা উড়াইতে উড়াইতে চলিয়াছে। ধীরে ধীরে ট্রাম আবার চলিতে আরম্ভ করিল। ফোর্ট হইতে ইংরেজ সৈনিক বাহির হইয়া আসিতেছিল। পূর্বদিকে চৌরঙ্গী আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। ট্রাম এস্‌প্লানেডে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সাড়ে ছয়টা। ধর্মতলার মোড়ে লোক ঠেলিয়া আর যাওয়া যায় না। একটা গ্রামোফোনের দোকানে বিঠোফোনের রেকর্ড বাজিতেছিল। প্রশান্ত একটু দাঁড়াইয়া শুনিল। ধর্মতলার ওদিকে গিয়া দেখিল—একজন অন্ধ একটা মাউথঅর্গ্যান অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

—অন্ধ হয়ে তোমার দ্বারে পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই।

প্রশান্ত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিল—কিন্তু কেন কে জানে—ওই লোকটির অন্ধত্ব তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। সে ফিরিয়া হোয়াইটওয়ের দোকানের দিকে চলিল। পথের পাশে অবগুণ্ঠন টানিয়া একটি মেয়ে ছোট একটি ছেলেকে একখানা গামছার উপর শোয়াইয়া হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। প্রশান্ত একবার মাত্র দেখিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। হোয়াইটওয়ের দোকানের কাচের দেওয়ালে দেওয়ালে বিবিধবর্ণে অনুরঞ্জিত অক্ষরে লেখা—এক্স'মাস বাজার নাউ ওপেন। ভিতরে অত্যুজ্জ্বল নানা রঙের আলোকসজ্জা, রঙিন কাগজের কাপড়ের মালা, সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট তাহারই মধ্যে পণ্যসম্ভার চক্‌চক্‌ করিতেছে। বহুপ্রকারের বহুমূল্য পরিচ্ছদ, খেলনা, বাসন, শয্যা, উপহারের সামগ্রী, নানা বর্ণ, নানা আকার—মানুষকে আকর্ষণ করিতেছিল। চারিপাশ নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছে। কার্জনপার্কে মরসুমী ফুলের রাজ্যে এত মধুমক্ষিকার সমারোহ কখনো হয় না। প্রশান্তের চিত্তের অবসাদ যেন কাটিয়া গেল। মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে সে চলিয়াছিল।

একস্থানে নানা আকারের, নানা প্রকারের ফাউণ্টেন পেন সাজানো ছিল—সেইখানে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কালো রঙের পিচবোর্ডের গোল চাকতিতে দাম লেখা ছিল—সে ভাল পড়িতে পারিল না। আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িতেই কাচের দেওয়ালে তাহার মাথাটা ঠুকিয়া গেল। সে হাসিয়া সরিয়া আসিল।

ওখান হইতে সে চলিল নিউ মার্কেটের দিকে। অন্যদিন ফিটনওয়ালারা বড় জ্বালাতন করে, আজ কিন্তু সকলেই উল্লসিত ব্যস্ততার সহিত গাড়ী লইয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ গাড়ীই পণ্য বোঝাই। ওদিকে একটা কাফেতে কি হোটেলে বাজনা বাজিতেছিল। এদিকে পিক্‌চার প্যালেসের রুদ্ধদ্বারের অভ্যন্তরে ধ্বনিত বাদ্যধ্বনির ক্ষীণ রেশ ভাসিয়া আসিতেছে। কয়জন কুলি হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পথপার্শ্বে একদল দেশী খৃষ্টান হাত পা কাঁপাইয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। নিউ মার্কেটে ঢুকিয়া প্রশান্তের চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল। আলোকে আলোকে যেন দিনের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহারই প্রতিচ্ছটায় উজ্জ্বল রামধনুর মত বিবিধ বর্ণের রাশি রাশি পণ্যসম্ভার। জুয়েলারী, স্টেশনারীর দোকানের পণ্যগুলি যেন খসিয়া পড়া স্বর্ণকণা। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ হইল না, জনস্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রশান্ত এইবার জনস্রোতের দিকে চাহিল। এ-ও সেই সর্ব জাতির সম্মিলন! সুবেশ সুশ্রী মুখগুলিতে সুখের দীপ্তি যেন ধরে না। নারীর চোখে কুণ্ঠাহীন বিলোল দৃষ্টি—পুরুষের দৃষ্টি লুব্ধ কামনায় উগ্র। মধ্যে মধ্যে একটি দুইটি ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। সম্মুখেই একটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক স্ত্রী পুত্র লইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে সুখের আভাস। ছেলেটি বলিল,—দেখ, দেখ, ঘোড়াটা কেমন সুন্দর! আর ওইটে—ওই বড় পুতুলটা।

মা বলিলেন—দেখ না গো—কত দাম?

প্রশান্ত তাদের পিছনে ফেলিয়া চলিল। মাথার উপর ঝুড়ি তুলিয়া কয়টা কুলী উৎসাহদীপ্ত মুখে চলিয়াছে। একটা জুয়েলারীর দোকানে কয়জন ধনী বাঙ্গালী তরুণী কি কিনিতেছে। দোকানে দোকানে ইউরোপীয় নরনারীর ভিড়।

প্রশান্ত আসিয়া মধ্যস্থলের পরিসর গোলাকার স্থানটির মধ্যে দাঁড়াইল। চারিদিকের রাস্তার চারি মোড়ে কালো পোশাক পরিয়া ইংরাজ সান্ত্রী চিত্রার্পিতের মত স্থির গম্ভীর চালে দাঁড়াইয়া আছে—পাশে একজন করিয়া দেশীয় প্রহরী। কোন কোন ইউরোপীয় নারীর মুখে সিগারেট—উজ্জ্বল চঞ্চল গতি—পুরুষদেরও তাই। গতিভঙ্গির মধ্যে মত্ততার আভাস পাওয়া যায়। প্রশান্তের মনেও যেন নেশা ধরিয়া গিয়াছিল। সে ভুলিয়া গেল যে, পৃথিবীতে অভাব আছে, দুঃখ আছে। কুলিদের পর্যন্ত হাসিমুখ! যেখানে এত রাশি রাশি ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে—কোথায় সেখানে অভাব! সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রূপকল্পনার শক্তিতে—শিল্প-রচনার কৃতিত্বে আর সেই শিল্পগুলির সন্নিবেশসজ্জার জ্ঞানে প্রশান্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মানুষের শিল্পজ্ঞানের গুরুপ্রকৃতিও বুঝি তাহার কাছে হার মানিয়াছে।

আবার সে চলিল। জনতার চাপে—শ্বাসপ্রশ্বাসে, সিগারেটের ধোঁয়ায় যেন বায়ুস্তর ভারী হইয়া উঠিয়াছে। সে ফুলের বাজারের দিকে ভাঙ্গিল। সেখানেও তাই—ভিড় যেন বরং বেশী। সমস্ত দোকানের সম্মুখভাগ জনতায় অবরুদ্ধ; প্রশান্ত যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল—মাথার ভিতরে কেমন করিতেছিল; সে বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত মারকেটটা বেড় দিয়া ঘুরিয়া সে আসিয়া কর্পোরেশন আপিসের সামনের পার্কটার মধ্যে বসিল। শীতল বাতাস টানিয়া লইয়া বুকটা যেন সুস্থ হইল,—ক্রমশঃ মস্তিষ্কও শীতল হইয়া আসিতেছিল।

স্থানটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার—উপরে নীল আকাশের খণ্ড ভাগ কোটী কোটী তারকায় আচ্ছন্ন। প্রশান্ত কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল—মহামানবের জন্ম দিনের পূর্ব-সন্ধ্যা সার্থক হইয়াছে। কিন্তু মন সায় দিল না। অন্তশ্চেতনার মধ্যে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহার ভাবুক মন, সে জাগিয়া উঠিয়া বার বার প্রতিবাদ করিল। প্রশান্তের মনে হইল এ যেন কোন স্বৈরিণী বিলাসিনীর প্রদীপ্ত উগ্র রূপ—লজ্জায় মৃদু নয়, মমতায় করুণ নয়, স্নেহে কোমল নয়। বেদনাবোধশক্তি, তাহার প্রকাশশক্তি, মানুষ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ওই অন্ধের গানের মধ্যে, ওই নারীটির প্রসারিত করসম্পুটের ভঙ্গিমায়, ওই দেশীয় খৃষ্টানের দীনতার মধ্যে কোথাও সে অকৃত্রিম বেদনার সন্ধান পাইল না। তাহার মনে হইল, এত যে আনন্দ, এতটুকু ইহার বুকের আনন্দ নয়—মুখের আনন্দের ছন্দ-রচনা; এত যে উল্লাস, এক বিন্দু তাহার মনের উল্লাস নয়—সমস্ত ধনের উল্লাস। এই বিপুল আয়োজনের মধ্যে ভক্তির অভিলাষ সে দেখিতে পাইল না—শক্তির বিলাসলীলা উগ্র দাম্ভিকতায় তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। পার্কটির কোণে রাস্তার মোড়ের উপর সহসা সে দাঁড়াইয়া গেল। একটি বাঙালী ভদ্রলোক—একটি মহিলা বিপন্নভাবে একটি ছেলের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতেছিলেন। ছেলেটি রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল।

ভদ্রলোক বলিতেছিলেন—কাল কিনে দেব তোকে। মার্কেটে ত কই বল্লি নে; তখন চুপ্ ক'রে রৈলি—এখন সমস্ত খরচ হয়ে গেল। মা বলিলেন—অমি, ওঠ-ওঠ, এখুনি মোটর এসে পড়বে। আর আমরা গরীব, আমরা ও দামী খেলনা কোথা পাব? ছিঃ—।

প্রশান্ত বুঝিল জন্মগত দারিদ্র্য যে সংযম শিখিতে ওই শিশুকে বাধ্য করিয়াছে তাহারই শিক্ষায় চোখে দেখিয়াও শিশু এতক্ষণ সন্তুষ্ট ছিল। এখন এই স্বপ্নরাজ্যের বাহিরে অন্ধকারে আসিয়া তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া

গিয়াছে। যে শিশু চাঁদ চায়, সেই শিশু ও। তাহার মণ্টুকে মনে পড়িয়া গেল—শুধু মণ্টু নয়—তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে লক্ষ লক্ষ শিশুর বেদনা মূর্ত হইয়া উঠিল। এই মুহূর্তে আজিকার সমস্ত আয়োজনের উজ্জ্বলতা শিশুটির অকৃত্রিম বেদনার পটভূমির উপরে দ্বিগুণিত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

—এই—এই—হটো—হটো—।

ছেলেটার সম্মুখে প্রচণ্ড একখানা মোটর ব্রেকের বিপুল শব্দ তুলিয়া থামিয়া গেল। ড্রাইভার ধমক দিয়া উঠিল—এই উল্লু—।

ভদ্রলোক ছেলেটির গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিলেন —হারামজাদা ছেলে।

প্রহারের বেদনা তখন শিশুর কাছে তুচ্ছ—সে উন্মত্তের মত কাঁদিয়া উঠিল—ওই নেব আমি।

গাড়ীর আরোহী একজন ধনী ইংরাজ ভদ্রলোক ও একটি মহিলা —তাহাদের কোলের উপর নানাবিধ বহুমূল্য খেল্‌না রাস্তার আলোক-সম্পাতে ঝলমল করিতেছিল।

ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল, কিন্তু পর মুহূর্তে থামিয়া গেল। মহিলাটি দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। খেল্‌নার ঝুড়িটি রোরুদ্যমান শিশুর সম্মুখে ধরিয়া ভাঙা বাংলায় বলিলেন—বেবী, কোন্‌টা নিবে তুমি?

প্রশান্তর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দুই সহস্র বৎসরের এই স্মরণীয় পবিত্র সন্ধ্যা আজও সার্থক, পবিত্র হইয়া উঠিল। সেও পকেটে হাত দিয়া ছুটিল মার্কেটের দিকে, মণ্টুর জন্য মোটরকার কিনিতে।

আলো-আঁধারি

একটি দরিদ্র পরিবার।

জাতির আভিজাত্য দারিদ্র্যকে আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে হয়, একান্ত দরিদ্রের মত থাকা চলে না; দু'টি শিশু, তাহাদেরও নগ্ন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন করিয়া রাখা চলে না। অভ্যাসের বশে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রদের চেয়ে অভাববোধের তীক্ষ্ণতা তাহাদের স্বাভাবিক। অতৃপ্তি পরিবারের প্রাণী কয়টির বুকে বুকে ধিকি ধিকি করিয়া অবিরতই জ্বলে। অশান্তির আগুন ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে; যে সময়টুকু জ্বলে না সে সময়টুকুতে থাকে উত্তাপ,—দগ্ধ বুকের জ্বালা।

এর জন্য দায়ী কে? অদৃষ্ট?

অদৃষ্ট সে অ-দৃষ্ট, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া লোকে প্রত্যক্ষ হেতু যাহাকে পায় তাহাকেই ধরে, তাহারা ধরে সুখময়কে; সুখময় সংসারটির কর্তা।

সুখময়ের গোঁয়ার্তুমি এ দুর্দশার হেতু; সুখময় গোঁয়ার।

আসল কথাটা হইতেছে বোধ করি এই—মানুষ জন্ম-বিদ্রোহী, শৈশবেই শাসন-নিষেধ অমান্য করায় একটা প্রধান আনন্দ; জীবনের প্রারম্ভে সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের প্রচেষ্টা তাহার এই ধর্মের আত্ম-প্রকাশ। এ প্রতিষ্ঠা কি? এ প্রতিষ্ঠা হইতেছে প্রতিষ্ঠিত বর্তমানকে ডুবাইয়া দিয়া নূতন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রচার করা; এই তো বিদ্রোহ। কিন্তু প্রতিষ্ঠাই তো সংসারে শক্তির মাপকাঠি নয়, কারণ—কাল ও ক্ষেত্রের রুক্ষতায়, অনুর্বরতায় প্রাণময় বীজেরও আত্মপ্রকাশের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। কেউ এদিকে দেখে না, মজাই এই যে এ সংসারে যে প্রতিষ্ঠাবান তাহারই শক্তি সার্থক। সে-ই মানুষের মত মানুষ; আর ব্যর্থ যে, সে অক্ষম, অমানুষ, অপদার্থ।

আবার সেই অক্ষম যদি মাথাটা খাড়া করিয়া চলিতে চায়, তবে সে গোঁয়ার।

ঐ জাতীয় গোঁয়ারের মতই তার বিপরীত বুদ্ধি, বিকৃত দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে দুনিয়ার মানদণ্ডে ধনের চেয়ে মানুষের দিকটা ভারী।

দরিদ্রের ছেলে সুখময়, বহু কষ্টে বি-এ পাশ করিল নিজের চেষ্টায়, আর পাশ করিল বেশ কৃতিত্বের সহিত। এই জন্যই ধনী ব্যবসায়ী হরিশবাবু কন্যা সারদাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার আশা ছিল, ছেলেটি আপন কৃতিত্বেই একটা বড় গোছের সরকারী চাকরী অর্জন করিবে। মহাধনী হরিশবাবুর সরকারী চাকুরেদের উপর শ্রদ্ধা অসীম। তিনি আজ নাই কিন্তু পুত্র পরেশ সে শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াছে।

সুখময় কিন্তু সকলের কল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিল; চাকরীর উদ্যোগ-পর্বেই সে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যে শুভাকাঙ্খী সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া গেলেন। ১৯২১ সালে সে এম-এ পড়া ছাড়িয়া কয়েক মাসের জন্য জেলে ঢুকিয়া বসিল। শুধু তাহার বিধবা মা কহিল, "ছেলে আমার বড় হয়েছে, যা সে ভাল বুঝেছে, করেছে, তাকে আমি মন্দ বলতে ত পারব না; সুখময় ত মন্দ কাজ কখনও করে না।"

শ্বশুরবাড়ীর সকলের কিন্তু শ্রদ্ধা চলিয়া গেল। দেশের দশেরও গেল; উপরন্তু দেশের দশের সঙ্গে বনিল না তার ঐ গোঁয়ার্তুমির জন্যই; চাকরী যদি বা পরে একটা মিলিল, তাও মনিবের সঙ্গে বনিল না, ধনীকে বড় স্বীকার না করায়, আর মাথা তুলিয়া চলার অপরাধে। এমন কি ঐ অপরাধে ধনী শ্যালক পরেশের সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইয়া গেল। নইলে শ্যালক পরেশের কারবারে পঞ্চাশ জন

লোক খাটিয়া খায়, মাসে চারি টাকা হইতে একশত দেড়শত টাকা বেতনের কর্মচারীও ছিল। কিন্তু তবু সুখময়ের দারিদ্র্য ঘুচিল না, পরেশও আহ্বান করিল না, সুযোগ্যতা সত্ত্বেও সুখময় কখনও কিছু বলিল না। শুধু বলিল না নয়, সামাজিক সৌজন্যের ও আচার ব্যবহারের যতটুকু একান্ত প্রয়োজন তাহার একচুলও ওদিকে আগাইয়া গেল না।

সুখময়ের স্ত্রী সারদা পরেশের ছোট বোন, দুটি ভাইবোনে গভীর ভালোবাসা ছিল, আজও আছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মাঝে বসিয়া পরেশ মাঝে মাঝে ছোট বোনটির কথা ভাবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দারিদ্র্যের যন্ত্রণার মধ্যে সারদার পাঁচ জনের কাছে দাদার গল্প ফুরায় না। কত নিরালা সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখের জল ঝরে, দাদার মুখ মনে পড়ে।

এমনি কোন্ এক স্মৃতিস্মরণের মুহূর্তে বিচলিত হইয়া পরেশ অগ্রহায়ণ মাসে প্রচুর দ্রব্যসম্ভার দিয়া এক তত্ত্ব পাঠাইল; ছেলেদের জামা, গায়ের কাপড়, সারদার জন্য শাল কাপড়, সুখময়ের জন্য শাল; ঝাল মশলা, ঘি, তেল, একটি গৃহস্থের ছয় মাস চলিবার মত সামগ্রী। দশ দশটা লোক ভারে বহিয়া আনিয়া হিমসিম খাইয়া গেল। সুখময়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে সারদার কাপড়চোপড়গুলি তুলিয়া লইয়া বাকী সব জিনিসগুলি ফেরৎ দিল। পরেশের বাড়ীর পুরাতন চাকর গৌর করজোড়ে কহিল, "জামাইবাবু।"

সুখময় তাহার বক্তব্য বুঝিয়াছিল, সে হাসিয়া কহিল, "গৌর, তোমাদের বাড়ীর জামাই-এর কি দান গ্রহণ করা উচিত?"

গৌর জিভ কাটিয়া কহিল, "রাধে রাধে, আমাদের জামাইবাবুকে দান করবার মত দাতা কে? আর দান করবার মত সামগ্রীই বা দুনিয়ায় কই? এ তো দান নয় জামাইবাবু!"

সুখময় আলোচনার ধারাটা পাল্টাইয়া দিয়া কহিল, "রমেন্দ্র কেমন আছে গৌর ?"

রমেন্দ্র সুখময়ের ছোট ভায়রাভাই, বড়লোকের ছেলে, হাইকোর্টের উকীল।

গৌর কহিল, "ভালোই আছেন।"

"শুভদা ?"—সারদার ছোট বোন।

"তিনিও বেশ ভাল আছেন।"

"শুভদার তত্ত্বে কি দিলেন এবার ?"

গৌর হাসিয়া কহিল, "তাঁর তত্ত্ব তো এখন নয়, সেই দোলের সময়।"

সুখময় হাসিয়া কহিল, "তবে গৌর, বলছিলে যে এ দান নয়! সে হ'ল বাড়ীর ছোট মেয়ে, তার তত্ত্ব হ'ল না, আর আমার বাড়ী অসময়ে তত্ত্ব এলো! তার মানে আমার অভাব পূরণ করা নয় কি গৌর ?"

গৌরের আর উত্তর যোগাইল না।

অগত্যা তাহাকে দ্রব্যসম্ভার লইয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু দশ দশটি লোককে খাইয়া আসিতেও হইল। আবার বারোটি টাকা বিদায়ও লইতে হইল;—দশজনের দশটাকা নিজের দুই টাকা;—'না,' বলিতে তাহার সাহসও হইল না; ইচ্ছাও হইল না।

যাইবার সময় সে বলিয়া গেল,—"জামাইবাবু, সার'-দিদির আমার মা দুর্গার মত ভাগ্য, রাজরাণী হ'লেও এর চাইতে তাঁর মান বাড়তো না।"

সারদা একটিও কথা কহিল না, সে নীরবে ঐ দশটি লোককে খাওয়াইল, নীরবেই অঙ্গের শেষ আভরণ হাতের রুলী জোড়াটি খুলিয়া দিল, ঐ বিদায়ের টাকা কয়টির জন্য নীরবেই সে গৌরের প্রশংসা-বাণী শুনিল, নীরবেই তাহার কাপড়চোপড়গুলিও ভারে তুলিয়া দিল,—একটিবারের জন্য চোখ ছল্‌ছল্‌ করিল না—একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়িল না।

গৌরের দল চলিয়া গেলে হাত পা ধুইয়া সুখময়ের জন্য খাবার জায়গা করিয়া সুখময়কে ডাকিল—"এসো, খাবে এসো।" কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই, বাষ্প নাই, আনন্দও নাই, দরদও নাই—নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

সুখময় শুইয়া পড়িয়াছিল, সে হাসিয়া কহিল—"ছেলেরা খেয়েছে?"

"খেয়েছে।"

"এখনও আছে?"

"আছে।"

"ছেলেদের ওবেলা হবে?"

"হবে।"

"তোমার?"

"হবে।"

সুখময় উঠিয়া আসনে বসিয়া হাসিমুখে কহিল—"এই জন্যেই শিব বেছে বেছে অন্নপূর্ণার দোরে হাত পেতেছিলেন।" সুখময় একটু তোষামোদ করিল, প্রিয়জনের এই শীতল অভিমান বড় কঠিন বস্তু; সরোষ অভিমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা চলে কিন্তু এর কাছে নত না হইয়া উপায় নাই।

স্বামীর এই তোষামোদে কিন্তু সারদার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বাসভরেই কহিল,—"আমার দাদার অপমানটা না করলেই হ'ত না?"

সুখময়ের দুর্বলতাই হউক আর দোষই হউক সেটা ঠিক এইখানে,—ধনীকন্যা সারদা আর্থিক আর তাহার বাপের বাড়ী সম্বন্ধীয় কোন কিছুতে প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেই সুখময় আপনাকে হারাইয়া ফেলিত,—তাহার মনে হইত ধনীকন্যা সারদা তাহার ঘরে সুখী নয়—এ অসন্তোষ যেন তাহারই ইঙ্গিত—সারদার প্রতিটি ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, আচারে ব্যবহারে, এ অসন্তোষ পরিস্ফুট মনে হইত। সুখময় আজও উষ্ণ হইয়া উঠিল, মুহূর্ত

পূর্বের মধুর আত্মসমর্পণের ভাবটি কোথায় উপিয়া গেল। সে কহিল—"সে আমায় অপমান ক'রে না পাঠালে ত আমি অপমান করতে যেতাম না!—আর অপমান তুমি কাকে বল—অপমান সে আমাকে ক'রে পাঠিয়েছিল—আমি ফিরিয়ে দিয়েছি মাত্র।"

—"দেখ, সংসারে আত্মীয়-স্বজন—"

সুখময় বাধা দিয়া কহিল—"আত্মীয় তুমি কাকে বল—স্বজনই বা কাকে বল? আত্মার সঙ্গে মিলন না হ'লে আত্মীয় হয় না,—ধনীর স্বজন দরিদ্র নয়—দরিদ্রের স্বজনও ধনী নয়; সম্বন্ধ-বন্ধন হ'লেই আত্মীয়ও হয় না—স্বজনও হয় না—হয় কুটুম্ব, কুটুম্ব বল।"

—"ভালো কথা,—তাই হ'ল। কুটুম্বই হ'ল; কিন্তু কুটুম্বও ত সংসারের তত্ত্বাবার্তা নিয়ে থাকে, দুনিয়ার কেউ তাকে দান ব'লে অপমান করে না।"

—"আমি করি; দুনিয়ার মানুষে আর আমাতে তফাৎ আছে—সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।"

সারদা কহিল—"মন্দ কি হয়, না হ'তে পারে। মন্দ হলাম আমি, মন্দ আমার ভাই, তুমি মহাপুরুষ।"

সারদা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সুখময় কহিল,—বোধ হয় সে উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করিয়া লইয়া কহিল—"তোমার দোষ কি বল, মা-বাপই আমার জীবনের সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ ক'রে গেছেন সুখময় নাম দিয়ে, তুমি যে আজ মহাপুরুষ বলে আমাকে ব্যঙ্গ করলে তার আর দোষ কি! তবে এইটুকু তোমাকে বলি সারদা—যে, আমি মহাপুরুষ নই, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ।"

সারদা ভাতের থালাটা সামনে নামাইয়া দিয়া কহিল—"সে কি একবার? সে একশোবার, সে হাজারবার,—তুমি যে পুরুষ তার পরিচয় রাগেই পাওয়া যায়—আর তুমি যে মানুষ তার পরিচয় তোমার ব্যবহারে।"

সুখময় হেঁট হইয়া চুর দেওয়া ভাতের মাথাটি সবেমাত্র ভাঙ্গিয়াছিল সে হাত গুটাইয়া লইয়া খাড়া হইয়া কহিল—"কি বল্লে তুমি ?"

সারদার মাথায় বোধ করি রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল, সে কহিল—"যা বলেছি সে ত শুনেছ তুমি, ফিরিয়ে বলতে গেলে ঠিক সেই কথাগুলিই ত শুনিয়ে বলা যায় না।"

সুখময় স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিল—"হ্যাঁ শুনেছি আমি, কিন্তু আমার ব্যবহারটা কি খারাপ দেখ্‌লে তুমি শুনি ?"

সারদা কহিল—"খারাপ কি দেখবো ? তবে নিজে বুক বাজিয়ে মানুষ ব'লে অহঙ্কার করছ তাই বলছি,—বলছি, এই কি মানুষের বেঁচে থাকা ? কোন্ মানুষের ছেলে মেয়ে শীতে কষ্ট পায়—গায়ে একখানা কাপড় জোটে না, দেহের পুষ্টি আহার—তা জোটে না ! মানুষের ছেলের নইলে—এমন হয় ! না—না, উঠো না, উঠো না,—আমার মাথা খাও।"

সুখময় তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, সে কহিল—"না, আর রুচি হবে না সারদা, তুমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলে তা' আমি বুঝেছি। কথাটা হচ্ছে 'কুকুর বেড়াল।' বেড়ালের বাচ্ছাই এরকম কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি যা বল্লে সে ধারণা তোমার ভুল। বড় লোকের ঘরের মেয়ে তুমি—মানুষের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যে ধারণাটা তুমি পোষণ কর, সেটা ভুল। মানুষই সংসারে কষ্ট পায়, তাদেরই ছেলেমেয়ে এইভাবে শীতে কাঁপে, অপূর্ণ সাধ তাদেরই বুকে জ্বালা ধরায়। কিন্তু তবু তারা মাথা নীচু করে না, আপনাকে বিক্রী করে না। আর দুধে ভাতে পশমের গরমে কারা থাকে জানো ? তারাও মানুষ, কিন্তু ওদের চেয়ে ঢের ছোট মানুষ, —যারা অভাবের দায়ে নিজেদের বিক্রী করে তাদের সঙ্গেই এক শ্রেণী,

কোন তফাৎ নেই। সোনার ঝিনুক মুখে ক'রে আসে—বাপের পয়সায় বড়লোক যারা, এরা তারাই—নয়তো প্রবঞ্চক লুণ্ঠক, মিথ্যা কথায়, মিথ্যা ব্যবহারে অর্জন করা ধন যাদের, এরা তারাই। ধনীর প্রতি কপর্দকটিতে আছে বঞ্চনা, অক্ষম দীনের অভিশাপ।' অধিকাংশ তাই—অন্ততঃ তুমি যাদের অহঙ্কার কর তারা ঐ দুটোই। বাপেরও ধন ছিল, প্রবঞ্চনারও অন্ত নেই,—সেটা যেন ধর্ম-কার্য, বীরত্ব, পুরুষ-কারের মন্ত্র।"

সারদা ইহাতেও নিরস্ত হইল না, তাহার বুকের পুঞ্জিত অসন্তোষ আজ অগ্নি-সংযোগে বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে। সে কহিল—"আমার বাপ ভাইকে তুমি চোর বল্লে, কিন্তু তার সাফাই আমি গাইব না—গাওয়া আমার উচিত নয়। তুমি যা বললে তারই আমি জবাব দেব। দুঃখ স্বীকার ক'রে বেঁচে থাকা, বুকের জ্বালা বুকে চেপে রেখে কথাগুলো বিনিয়ে বলতেও ভালো, শুনতেও ভালো।—জিজ্ঞাসা করি এ সংসারে বঞ্চিত হয় কারা? যারা দুর্বল, যারা অপদার্থ, যারা অক্ষম, তারাই।—তুমি যে কথাগুলো বললে সে এ অক্ষম মনেরই সৃষ্টি করা, আত্মপ্রবোধের জন্যে বিন্যাস করা কথা। নইলে বঞ্চনা করাও যেমন পাপ, বঞ্চিত হওয়াও তেমনি অপরাধ!"

দুর্নিবার ক্রোধে সুখময় যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। যতটুকু জ্ঞান তখনও ছিল তাই আশ্রয় করিয়া সে ত্বরিতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু সুখময় ফিরিল না। সারদার বুকের উত্তাপ ততক্ষণে শীতল হইয়া আসিয়াছে; শান্ত সংহত মুহূর্তে সমস্ত স্মরণ করিয়া সারদার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ঐ আত্মাভিমানী মানুষটি তো তাহার অজানা নয়,—সে ত ভাল করিয়াই জানে মনুষ্যত্বের অভিমানই ঐ মানুষটির সবচেয়ে বড়।

আর আজ সে কুক্ষণে কুগ্রহবশে যাহা তাহাকে বলিয়াছে, তাহাতে সে তাহার মনুষ্যত্বের অভিমানকে উন্মাদিনীর মতই দুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে।

ক্রমশঃ রাত্রি অগ্রসর হইতেছে, তবু সে আসিল না। সে কি তবে দেশত্যাগী হইল ? আত্মহত্যা—তাও ত উত্তেজনার মুখে বিচিত্র নয় !

বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। তাও সে পারিল না।—"মা ঠাক্‌রেণ আছেন গো ?"

সারদা চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কে ?"

—"আমি গো মা, নোটন খালাসী ; বাবু ইস্টিশনে এই পত্রখানি দিলেন আর এই টাকা কটা—।"

ব্যাকুল আগ্রহে সারদা কহিল—"বাবু কোথায় ?"

—"তিনি ডাউন লাইনের ট্রেনে কোথা গেলেন।" বলিয়া নোটন খালাসী পত্রখানি ও টাকা কয়টি দাওয়ার উপর নামাইয়া দিল।

কয়টা টাকা বড় নয়—অনেকগুলি। কিন্তু সারদা টাকার পানে না চাহিয়া পত্রখানি লইয়া কেরোসিন ডিবের আলোতে পড়িতে বসিল।

নোটন কহিল—"টাকা ক'টা গুণে লেন মা, পনের টাকা আছে।"

পত্র পড়িতে পড়িতে সারদা বলিল—"আচ্ছা থাক, তুমি যাও।"

নোটন চলিয়া গেল,—সারদা চিঠিখানা পড়িল—

"সারদা—

"মনের ক্ষোভে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম,—কি করিতাম তা আমি ঠিক জানি না,—হয়ত সব কিছু পারিতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ কমিতে ভাবিয়া দেখিলাম তোমার কথাই ঠিক। আমি যাহা বলিয়াছিলাম,—তুমি সত্যই বলিয়াছ,—সেগুলো অক্ষম অপদার্থের আত্ম-সান্ত্বনার জন্য সৃষ্টি করা বচনবিন্যাসই বটে। সত্য কথাই ত—সংসারে যাহার কিছুই নাই তাহার ত্যাগের মূল্য কি ? নিঃস্বতা আর ত্যাগ দুইটা সম্পূর্ণ

বিপরীত বস্তু। দুঃখের গর্ব, ত্যাগের অহংকারের মূল্য কি তাহার? সঙ্গে সঙ্গে সেই শেয়ালের গল্পটা মনে পড়িল,—আঙ্গুর পাড়িতে অক্ষম হইয়া সে বলিয়াছিল আঙ্গুর টক।

"তাই আজ হইতেই আমার জীবনের ভুল সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পনেরটা টাকা পাঠাইলাম, ভুল বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ আমার হাতের মুঠায় আপনি আসিয়া গেল। আজই এখানে রেজেষ্ট্রি আপিসে একটা বড় দলিলের একজন সনাক্তদারের প্রয়োজন ছিল, সেই সনাক্ত দিয়া কুড়িটা টাকা পাইলাম। দুইটা মিথ্যা কথার দাম কুড়িটা টাকা,—বলিতে হইল, "আমি ইহাকে চিনি।" বোধহয় দলিলটায় গলদ আছে—হয়ত বা জাল; কিন্তু আমার তাহাতে কি যায় আসে?—আমি পাঁচটা টাকা লইয়া কাজের চেষ্টায় চলিলাম, বাকী পনের টাকা পাঠাইলাম; ভয় নাই—দেশ-ত্যাগী হইব না,—আত্মহত্যা করিব না,—সময়ে সব সংবাদই দিলাম। পরিশেষে আরও একটা কথা জানাই—আজ পরেশকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলাম, সে যাহা পাঠাইয়াছিল তাহা পুনরায় পাঠাইতেও লিখিলাম। মূর্খ আমি,—যদি কেহ দেয়, লইব না কেন?—

ইতি সুখময়—"

সারা অন্তরটা সারদার জ্বলিয়া উঠিল, কে জানে কেন, সুখময় আজ তাহাকে যে অপমানটা করিল এর চেয়ে বড় অপমান বুঝি আর হয় না। সে টাকা কয়টা মুঠায় পুরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আপন মনেই, "তাও ভাল, সুমতি যে হয়েছে সেও আমার ভাগ্যি—কাল দেবতার পূজো দেব আমি। এই টাকা তোলা রইল।"

কিন্তু অশ্রু তখন চোখের কূল ছাপাইয়া ফেলিয়াছে, দু-ফোঁটা অশ্রুও মাটিতে পড়িয়া শুষিয়া গেল,—কিন্তু দুটি সিক্ত বিন্দুতে তাহার চিহ্ন জাগিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, রাজপথের আলোক এখনও সমান উজ্জ্বল, কিন্তু লোক ক্রমশই বিরল হইয়া আসিতেছে। সুখময় লক্ষ্যহীন গতিতে চলিয়াছে। চাকরী মেলে নাই, তিন দিনের পর ধরমশালায় আর থাকিতে দেয় নাই। পকেটে আর মাত্র একটাকা কয় আনা অবশিষ্ট। তাই লইয়া আজই সন্ধ্যায় সে পথে বাহির হইয়াছে। অপর একটা ধর্মশালা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ক্লান্ত দেহ আর চলিতেছে না।—একজনের দাওয়ায় উঠিয়া একবার সে রাত্রি যাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামী চোর বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সুখময়ের বড় রাগ হইয়াছিল; তাহার মুখে আসিয়াছিল—"আমি চোর! আর তুমি সাধু?—চুরি না করিলে এই পাকাবাড়ী, বিজলীবাতি, পাখা—তোমার হইল কিরূপে?" কিন্তু চাপিয়া যাইতে হইয়াছে। খানিকটা আসিয়াই তাহার হাসি আসিল—'চুরি! তাই বা পারিলাম কৈ? সারাটা দিনে খাইয়াছে ত মোটে দশ পয়সার। উপার্জন করিতে যে পারে না—সে-ই খরচের ভয়ে সারা হয়! কাপুরুষের দল সব! চুরি, সেও ত একটা উপার্জন! সে করিতেও ত একটা সাহসের প্রয়োজন।

সাহস?—হ্যাঁ—সাহস বৈকি,—নৈতিক না হোক, অবনৈতিক ত বটে,—তাহা হইলে ত এমন অবনৈতিক ভাবে রাস্তার খবরদারী করিয়া ফিরিতে হয় না। আবার সে হাসিল,—হাসিল সে আপন মনের কথার অনুপ্রাসের ছটায়। মনে হইল সাহিত্যিক হইলে মন্দ হইত না,—এদেশের ব্যবস্থাটা অবস্থার সহিত মিলিত ভাল।

তাহার মুখের হাসি কিন্তু মুখেই মিলাইয়া গেল,—সহসা কাহার কর-স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দেখে—একটা পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা যায়ে গা?"

সুখময় কহিল—"ই—ধার।"

গম্ভীরকণ্ঠে সিপাহীটা কহিল—"ই—ধার কাঁহা?—ঠিকানা কেয়া?"

একটা বাজে ঠিকানা বলিলেই সব চুকিয়া যায়, কিন্তু মিথ্যা বলিতে কি জানি কেন সুখময়ের প্রবৃত্তি হইল না। সিপাহীটার চোখে দীপ্ত চক্ষু রাখিয়া সে কহিল—"ঠিকানা কিছু নাই আমার—মাথা গুঁজবার জায়গাই খুঁজছি।" সুখময়ের এ উদ্ধতভাব শক্তিমত্ত সিপাহীটার কানে বেশ মধুর ঠেকিল না। সে চড়াৎ করিয়া সুখময়ের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল—"ঠিকানা নেহি হ্যায় হামারা! শালা চোট্টা—আও।"

সুখময়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া গেল,—সে ঐ চড়টার উত্তর দিতে হাত উঠাইতে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে-ইচ্ছা সংবরণ করিল। ক্ষণপরে সে হাসিয়া কহিল—"চল, রাতের মত গড়াবার জায়গা মিলবে ত?"

জায়গা মিলিল পুলিশ হাজতে।

লম্বা ঘর, দশ পনের জন আসামী তখন আসিয়া গিয়াছে।—কেহ শুইয়া দিব্য আরামে নাক ডাকাইতেছে, একজন কোণে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে, ওদিকের কোণে একজন বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে।—সে হয় পাগল নয় মাতাল। যে লোকটি বিড়ি টানিতেছিল সে সুখময়কে দেখিয়া কহিল—"ওয়েলকম মাই ফ্রেণ্ড, পিক্‌পকেট নাকি?"

বিড়ির ধোঁয়ায়, মদের গন্ধে, অপরিচ্ছন্ন জনের গায়ের গন্ধে সুখময়ের খালি পেট মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। তার উপর এই হীন সংশ্রব আর কদর্য প্রশ্নে আত্মা যেন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। সে গম্ভীরভাবে কহিল—"না।—না!"

"তবে কি গুণ্ডাইজ্‌ম নাকি?"

সুখময়ের কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে পূর্ণ জবাব দিয়া প্রশ্নোত্তরের হাত হইতে এড়াইতে চাহিল, সে কহিল—"রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আমার অপরাধ। আশ্রয় ছিল না।"

লোকটা বারকতক ঘন ঘন বিড়িতে টান্ মারিল, কিন্তু বিড়িটা একে-

বারেই নিভিয়া গিয়াছিল,—আগুন আর জাঁকিয়া উঠিল না। সে হাত পাতিয়া সুখময়কে কহিল—"ম্যাচিস্‌টা দেখি।"

—"নাই—।"

বিড়িটা সজোরে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে কহিল—"সেপাই বেটা যখন পিছু নিলে দেখলে—তখন একটা খোলার ঘরে ঢুকে পড়লেই হ'ত। কোন রাস্তায় ত মেয়েমানুষের খোলার ঘরের অভাব নেই।"

সুখময়ের অবরুদ্ধ ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না।—সে বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"মশাই, আমি ভদ্রলোক—!"

লোকটা হাহা করিয়া উঠিল,—সুখময় যেন মস্ত একটা রসিকতার কথা বলিয়াছে। যে লোকটা বিড় বিড় করিয়া বলিতেছিল, ওদিক হইতে সে সহসা সজাগ হইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল—"কে বাবা জন্মেজয় ধর্মপুত্তুরের নাতির বেটা, মেয়েমানুষের নামে ঘেন্না কর—ভা—র-তো ও শ্মশান—ও মাঝে-এ আমি রে অবলা বালা! সেই অবলা বালাকে অবহেলা—ক্যাহে তুমি?"

সুখময় বিনাবাক্যব্যয়ে সেইখানে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল,—তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ঠিক পাশেই একটা লোক তাহারই মত আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া আছে, তাহার ছেঁড়া ময়লা চিট কাপড়খানার কি দুর্গন্ধ।

সুখময়ের বমি [illegible]—মুখ ফিরাইয়া শুইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার পূর্বেই সে লোকটি কহিল—"চেপে যান বাবু, ওদের সঙ্গে কথা কইলেই অপমান, আর ঝগড়া ক'রেও পেরে উঠবেন না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন।" অতি মৃদুস্বর, তাহাতে একটি সরল মমতার রেশ বাজে, যে মমতা মানুষের কাছে মানুষের প্রাপ্য,—আর আছে একটি সহজ সরল অনাড়ম্বর শীলতা।

সুখময় বিস্মিত লইয়া গেল।—এই এমন ঘৃণ্য কদর্যতার মধ্যে অকৃত্রিম শীলতার বাস দেখিয়া, তাহার মুখ ফিরাইয়া শুইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল,—কিন্তু লোকটি নিজেই কহিল—"আপনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন—আমার কাপড়ে বড় দুর্গন্ধ,—আমার নিজেরই বড় কষ্ট হচ্ছে,—আপনার ত হবারই কথা। এখনও রাত অনেক বাকী, ওদিক ফিরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"—

সুখময় কহিল—"আপনাকে কেন ধরেছে?"

লোকটি যেন হাসিয়া কহিল—"আমি আপনি নই বাবু, আমি ছোট জাত, মুচী;—জুতো সেলাইয়ের পয়সা নিয়ে এক বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল,—রাগের মাথায় পয়সার জন্যে তার ছাতা আটকেছিলাম—তাই বাবু পুলিশে দিলেন।" সুখময় মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল এই লোকটির সঙ্গে একটি মর্মের আত্মীয়তা স্থাপন করিতে—ইহার সহিতও যেন তাহার আত্মার মিলন সম্ভব। কিন্তু লোকটির ঐ দুর্গন্ধময় বহিরাবরণ, ওর জাতির পরিচয় পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।—সুখময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম আসিল না। আসিল মস্তিষ্কের মধ্যে রাশি রাশি চিন্তা—একটার পর একটা—একটার পর একটা। আপনার দুবলতায় সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি করা ভেদনীতির ঈর্ষাভরা দুইটা অক্ষর তাহার সকল শক্তিকে মূক করিয়া দিল—। ওই একখানা বহিরাবরণ, আর ঐ তার চর্মের মালিন্য। যাহা ধুইলে উঠিয়া যায় তাহার জন্য মনুষ্যত্বকেও সে অপমান করিতে পারে? মেকী—মেকী—সে নিজেও মেকী;—কিংবা হয়ত মনুষ্যত্ব, মনুষ্যধর্ম—এই গুলাই ফাঁকি—মানুষের রচা কথা—এতদিনে মানুষ তাহার মোহ এড়াইয়া আপন পথ ধরিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে—মাতালটার বিড়বিড় আর শোনা যায় না। এপাশের বিড়িখোরটারও আর সাড়া পাওয়া যায় না। বাহিরে দিবসের কর্মমুখর জনারণ্য রাজপথ হইতেও আর কোন সাড়া শব্দ ভাসিয়া আসে না। তবু শোনা যায়—হাজতের বাহিরের লম্বা বারান্দায়—জাগ্রত প্রহরীর 'নাল'-মারা বুটের অবিশ্রান্ত শব্দ—খট্—খট্—খট্—খট্!

সহসা সুখময় উত্তেজিত ভাবে সেই লোকটির দিকে ফিরিয়া কহিল—"জান!"

লোকটিও ঘুমায় নাই, সে কহিল—"আমাকে বলছেন?"

—"হ্যাঁ,—জান—এরাই হচ্ছে সংসারে উপযুক্ত মানুষ।"

লোকটি কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারে না, সে চুপ করিয়া থাকে।

সুখময় আপন মনেই বলিয়া যায়—"এই এরা—এই মাতাল, এই বিড়িখোর, ওরা মিথ্যে মিথ্যে কখনও কষ্ট পায় না—ওরা বঞ্চনা করতে জানে—কৌশল জানে,—দুনিয়ার ফাঁকি ওরা ধরে ফেলেছে। উপযুক্ত মানুষের নিম্নতম শ্রেণী—এরা উপযুক্তই হ'চ্ছে—দুনিয়াকে যে যত এক্সপ্লয়েট্ করতে পারে।"

বোধকরি উত্তরের জন্যই সে ক্ষণেক নীরব রহিল কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। আবার সে আপন মনেই বলিয়া গেল—"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা দোষে লাঞ্ছনা ভোগ করে জানোয়ারের মধ্যে ভেড়া গোরু আর গাধা; চাতুরী জানে না—ছল জানে না, দেহের বল প্রয়োগ করিতে পারে না, এরাই নিরীহ ভালো মানুষ, অক্ষম অপদার্থ জীব। এরই জন্যে গোরু গাধা পশুরাজ হয় না, এরা হয় পশুরাজের ভক্ষ্য। এ বিধাতার ইঙ্গিত।"

মুচীটা বোধহয় এত কথা বুঝিতে পারে না, সে নীরব হইয়া রহিল, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

যাই হোক, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেল; ঐ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সুখময়ের কারা-নির্যাতনের দুর্ভাগ্যও শেষ হইল। সেটা ভাগ্যগুণে না ভাগ্যবৈগুণ্যে, সুখময় বুঝিল না। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবারের মত সাবধান করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া একবার সে চারিদিকে চাহিয়া রহিল—অগণিত জনস্রোত বিভিন্ন দিকে চলিয়াছে। কেহ ব্যস্ত, কাহারও মুখে কুটিল হাসি, কেহ ঠকিয়াছে, কেহ ঠকাইয়াছে!

পিছন হইতে একটা ধাক্কায় সুখময় মুখ ফিরাইতেই একজন বিরক্তি-ভরে তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করবেন? যত ভ্যাগাবণ্ডস্,—জেলে দেয় না এদের!" লোকটা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। সুখময়ের রাগ হইল না; তাহার মনে হইল ঠিক বলিয়াছে লোকটা—কর্মমুখর সংসারে চিন্তা করিবার অবসর নাই।

সুখময়ও চলিল।

সম্মুখেই দুটি বাবু চলিয়াছে, তাহাদের কথা আপনি কানে আসিয়া পশে,—"কাল যা দাঁও মেরেছি, বুঝেছ,—দশ টাকা দরে কেনা ছিল, চব্বিশ টাকা দরে ঝেড়েছি, পাঁচ হাজার টন।"

—"বল কি হে? হাণ্ড্রেড এণ্ড ফর্টি পারসেণ্ট প্রফিট্! এযে আলাদীনের ল্যাম্প হে! খাইয়ে দাও!"

—"অল্-রাইট্, একটা পার্টি দেব ভাবছি,—বেশী লোক নয়—পাঁচ সাতজন বন্ধুজন, বুঝেছ—কালই। বীণার বাড়ীতে কাল ঠিক সন্ধ্যে—আন্দাজ সাড়ে সাতটা—গান—পান তথা ভোজনের নেমন্তন্ন রইলো,—কি বল—?"

বন্ধুর হাতে ঝাঁকি দিয়া বন্ধু কহে—"থ্যাঙ্কস্। কিন্তু এখন এই সকালে যাচ্ছ কোথায় বল ত?"

—"স্যাক্‌রা বাড়ী,—বীণার জন্যে বউর সঙ্গে বড্ড ঝগড়া চলছে,—কাল সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারি নি—শেষে ভাই একটা নতুন হারে—কম্প্রোমাইজ্ হয়েছে। তাই চলেছি—কণ্ঠহার দিয়ে বউর কণ্ঠরোধ করতে হবে।"

বন্ধু হাসিয়া কহে—"দেখ ভাই—অলঙ্কার আবার না কণ্ঠের ঝঙ্কার বাড়িয়ে দেয়,—কণ্ঠহারে না কণ্ঠের মহিমা বেড়ে যায়!"

—"পাগল,—ও ভূষণ পেলেই ভাষণ মধুর হতে বাধ্য। এ পরীক্ষিত সত্য,—নর-নারীর কলহ পীড়ার মহৌষধ—দাম্পত্য অশান্তির দৈবলব্ধ শান্তি-কবচ। দোষের মধ্যে বিনামূল্যে পাওয়া যায় না।"

বন্ধু হাহা করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসে। এ বন্ধুটি বলিয়া যায়—"পয়সাকে তুমি এখনো সম্পূর্ণ চেন নি, নইলে এমন প্রশ্ন করতে না নিশ্চয়! বন্ধু, পয়সায় দুনিয়া বিক্রী হয়ে গেল,—মানুষ ত ছার!"

শ্রোতা বন্ধু কহে—"ইয়েস, দ্যাট'স্ ট্রু।"

দুই বন্ধু মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া বিদায় লইল, সুখময় তাহাদের সম্মুখ দিয়াই তাহাদিগকে পার হইয়া যাইতেছিল—তাহারও মুখ দিয়া আপনি মৃদুস্বরে বাহির হইল—"ইয়েস, দ্যাট'স্ ট্রু।"

চৌরঙ্গী, লাল বাজার, বাগ বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের তিনতলা চারতলা বাড়ীগুলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া চারতলা একখানা বাড়ীর লিফট্ ম্যানকে দুইটা পয়সা ঘুষ দিয়া সে যখন নামিয়া রাস্তায় আসিল, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা; শীতের দিন—সূর্য অস্ত যায় যায়। রাস্তায় বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে—গ্যাস জ্বলিতে শুরু করিয়াছে।

সুখময় আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে কর্জন পার্কে আসিয়া বসিল,—গান সে কখনও এমন করিয়া গাহে না।

চারিদিকের রাস্তা দিয়া অসংখ্য যান-বাহনের কোলাহলপূর্ণ চলাচল, বড় বড় জুড়ি, দীর্ঘদেহ নিঃশব্দ মোটরগুলা স্রোতের মুখে নৌকার মত দ্রুতবেগে স্বচ্ছন্দগতিতে চলিয়াছে। রাজপথের আলোকে আরোহী-দের জলজলে বেশভূষা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে,—ধন আর ধনীর সমারোহ!

শ্রান্ত পথচারীর দল রাস্তার এপার হইতে ওপার হইতেছে দ্রুতপদে শঙ্কাভরে।—গেল—গেল—ওই লোকটা বুঝি গেল!

যাক্,—লোকটা রক্ষা পাইয়াছে!

ল্যাণ্ডোখানার কোচম্যান লোকটার পিঠে একটা চাবুক কষিয়া দিল—"উল্লু—কাঁহাকা!"

—ঠিক হইয়াছে,—মূর্খ কোথাকার—পথ—সুমসৃণ রাজপথ পদচারীর জন্য নয়,—ও-পথ রথের জন্য—রথীর জন্য।

সুখময়ের দৃষ্টিটা টাটাইয়া উঠিল,—সে পথ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিল,—সারা বাগানটা ব্যাপিয়া কেয়ারীতে কেয়ারীতে মরসুমী ফুলের সমারোহ। ফুলগুলোকে দোলা দিয়া বিচিত্রবর্ণ পাখা মেলিয়া প্রজাপতির দল উড়িয়া বেড়াইতেছে। সহসা সুখময় হাতের এক ঝাপ্‌টায় একটা প্রজাপতি ধরিয়া নির্মম পেষণে দুই হাতে দলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। চলিল সে মাঠে মাঠে, পথ এড়াইয়া।—ওই আলোকের মালা, রথ রথী-সমারোহাকুল ওই রাজপথ। অসহ্য—ওর মাটিতে রথচক্র ঘর্ষণের সে মৃদু উত্তাপ—সে সুখময়ের অসহ্য!

কালীঘাটের মন্দিরে তখন শঙ্খ ঘণ্টা বাজে;—সুখময় মন্দিরে আসিয়া উঠিল। ফুলে, মালায়, দীপালোকে, ধূপগন্ধে চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ আবেষ্টনী,—সম্মিলিত নর-নারীর স্তব-গুঞ্জনে ভক্তির একটা মোহ চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। শান্ত স্নিগ্ধ বর্ণে গন্ধে গানে সুখময় অভিভূত হইয়া

পড়িল। সে ব্যাকুলভাবে দেবতার পানে চাহিয়া প্রণাম করিল—মা মা! স্তব-গুঞ্জনের তালে সে করতালি দিতে শুরু করিল।

"এই, এই,—মাগী,—হটো—হটো—হটো!"

সুখময় সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তের সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া এক পাণ্ডা হাঁকিতেছে—"এই মাগী হট্ যাও—হট্ যাও।"

মাথারও উচ্চে হাতের উপর তাহার নানা উপচারের সাজানো প্রকাণ্ড রূপার পরাত একখানি! পশ্চাতে তাহার একটি সুবেশ বাবু—সঙ্গে প্রজাপতির মত বিচিত্র-বসনা সুন্দরী নারী একটি। সর্বদেহে তাহার স্বর্ণ মণি মুক্তা ঝলমল্ করিতেছে। প্রতি অঙ্গটি তাহার চটুল চঞ্চল,—ঠোঁটের হাসিটি সরল উজ্জ্বল। তাহাদের পুরোভাগে পথরোধ করিয়া উঠিতেছে এক শীর্ণা বৃদ্ধা নারী, গায়ে একখানা ছিন্ন নামাবলী। পাণ্ডা তাহাকেই ধমক দিয়া পথ দিতে কহিতেছে। কিন্তু সংকীর্ণ সিঁড়িতে সরিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই,—বৃদ্ধা প্রাণপণ গতিতে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিতেই পাণ্ডা একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল—"মাগী যেন রাণী রাসমণি, গুণে গুণে পা ফেলছেন,—ভাগো! আসুন আসুন বাবু, জুতো ঐ সিঁড়ির উপরে খুলুন;—ওরে রামা, বাবুর জুতো জোড়াটা দেখিস্ তো। আসুন মা লক্ষ্মী, এই যে এদিকে, এই, এই পথ দাও হে—পথ দাও, মানুষ চেন না!"

পাষাণময়ী দেবী প্রতিমার অঙ্গে বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই। পটুয়ার তুলিতে আঁকা বড় বড় চোখ তেমনি স্থির। অগ্নিশিখা দূরে থাক্,—একবার করুণায় একটা নিমিখও পড়িল না। সুখময়ের চোখটা জ্বলিয়া উঠিল;—সে সেইখানে সজোরে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মন্দির-চত্বর হইতে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ফাঁকি—সব ফাঁকি,—কিংবা ধনের

লোভে দেবতাই ধনীর পূজা করে; ওর যে বিস্তৃত রসনা—ও রসনা ভোগ-লালসায় লক্ লক্ করে,—আজও সে লালসা মেটে নাই,—কখনও সে লালসা মিটিবে না—ও লালসার পরিতৃপ্তি নাই। আসিতে আসিতে দেখিল একটা খোলা পতিত জায়গায় একটা জনতা জমিয়াছে।

সুখময় বুঝিল এখানেও কোন জাল জুয়াচুরী চলিয়াছে।

সেও মাথা গলাইয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রকাণ্ড একটা কয়লার ধুনী—চারিপাশে তার নানা আকারের সন্ন্যাসী—দশ হইতে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসরের যোগীর দল,—গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, কারও গলায় লোহার শিকল, কারও গলায় স্ফটিকের মালা, কারও গলায় বা রুদ্রাক্ষ, কেহ বা হাড়ের গোল গোল চাকৃতি গাঁথিয়া পরিয়াছে।

ভক্তের দলও জুটিয়াছে। একজন যোগী হাত দেখিতেছেন, একজন ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কয়জন ভক্ত ভবিষ্যৎ জানিবার প্রত্যাশায় ধুনীর আলোকে আপন আপন হাত মেলিয়া রেখাগুলি দেখিয়া রাখিতেছে।

সুখময় সম্মুখে আসিয়া পড়িতেই বছর দশ বয়সের এক যোগী গম্ভীর-ভাবে কহিল—"কেয়া রে বেটা, হাঁত দেখলায়েগা তুম্?—আরে হাঁত মে কেয়া জরুরৎ—তেরা ললাটকে রেখা সে—হামারা মালুম হো গিয়া,—ললাটমে তেরা তিরশূল রেখা হ্যায়,—ভাগ্‌বান পুরুষ হো তুঁ;—লেকিন্ আব্ তেরা হাল বহুৎ খারাপ যাতা হ্যায়। আচ্ছা একঠো পঞ্চমুখ্ রুদ্রাখ্ তো তু ধারণ করো—"

যোগী সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিটা ঝাড়িয়া একটা রুদ্রাক্ষ সুখময়ের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। সুখময়ের হাসি আসিল। কিন্তু মনে মনে ঐ শিশুটির বিনয়বুদ্ধির তারিফ্ না করিয়া পারিল না,—একটা পয়সা সে পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভিড় হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

পিছন হইতে বাচ্ছা সাধুর কণ্ঠস্বর সে শুনিল—"আরে একঠো পয়সা,—আরে বেটা সাধু ভোজন ত করাও।" পথ চলিতে চলিতে সুখময়ের মনে হইল তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ওবেলা মাত্র ছ'পয়সার খাবার খাইয়াছে। পকেটে হাত দিয়া সে দেখিল এখনও আছে—একটা টাকা, সিকি, একটা আনি,—আর দুটো পয়সা। মুহূর্তের মোহে ঐ বাচ্চাটার ভণ্ডামীর পুরস্কার স্বরূপ একটা পয়সা দেওয়ার জন্য সুখময়ের অনুশোচনাও হইল।

একটা খাবারের দোকানে সে ঢুকিয়া পড়িল।

দোকানের চাকরটা কহিল—"ঢাকাই পরোটা দেব বাবু,—ফাউলকারী এই গরম নামলো, চপ্—"

সুখময় কহিল—"না।"

—"তবে?"

—"সব চেয়ে কম দামে যাতে পেট্ ভরে তাই দাও।"

তবু বিল হইয়া গেল—চৌদ্দ পয়সা।

সুখময় কহিল—"সাড়ে তিন আনা?"

—"শেষে একটা ডিম নিলেন যে বাবু, একটা চপ।"

সুখময় সিকিটা ফেলিয়া দিল,—দু'পয়সা পকেটে পুরিয়া চলিতে চলিতে সে অনুশোচনাটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিল,—বেশ করিয়াছে, মানুষ ত সে, লোভ ক্ষুধা ত তাহার জীবধর্ম—জন্মলব্ধ বৃত্তি,—সে বৃত্তির পরিতৃপ্তি তাহার আপনার নিকট জীবনের দাবী। এমনি একটা অসুস্থ আনন্দে, অস্বাভাবিক প্রফুল্লতায় রাস্তা ধরিয়া সে চলিল,—ঈষৎ কুব্জভঙ্গী, মাটির উপর নিবদ্ধদৃষ্টি দীর্ঘ পদক্ষেপে, হাত দুইটা পিছনের দিকে মুঠিতে মুঠিতে বাঁধা।

পথ জনবিরল হইতে শুরু করিয়াছে, সারাদিনের শ্রমকাতর দেহে একটা অবসাদ আসিয়াছে; শীতের হিমতীক্ষ্ণ বায়ু বুকের মধ্যে একটা কম্পন

বহাইয়া দেয়, সে কম্পনে মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া ওঠে, ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপে। একটা আরামের বিশ্রামের স্থান যদি এখন মিলিত!—একটু পরিচ্ছন্ন শয্যার উষ্ণতার মধ্যে—আঃ!—

সুখময় সহসা দাঁড়াইল। সম্মুখেই একটা শীর্ণ অন্ধকার গলির মোড়ে একটা জলের কলের পাশেই কয়টা নারী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

সুখময় মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজপথের আলোকের আভায় নারী কয়টির শীর্ণ মুখ অস্পষ্ট দেখা যায়।

সুখময় কিন্তু কাহারও মুখের পানে তাকাইল না। সম্মুখেই যে ছিল তাহাকেই সে কহিল—"রাতটা থাকতে দেবে?"

মেয়েটি কহিল—"আসুন।"

সে গলির মধ্যে অগ্রসর হইল, অন্ধকার হিমজর্জর গলিপথ সুখময়ের হিমকাতরতা বাড়াইয়া দিল; চলিতে চলিতে মেয়েটি কহিল—"এক টাকা লাগবে কিন্তু।"

সুখময় থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, এক টা-কা।

আর ত মোটে এক টাকা দুই আনা সম্বল তাহার।

মেয়েটিও দাঁড়াইয়া কহিল—"কি বলছেন আপনি?"

সুখময় ভাবিতেছিল—"তাই বা এমন কি বেশী? একটা আচ্ছাদনের তলে শয্যার উষ্ণতার মধ্যে পরম নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মত স্থিরতা—তার মূল্য হিসাবে একটা টাকা এমন কি বেশী! আটটা পয়সা ত থাকিবে!"

তবু সে বলিয়া ফেলিল—"কমে হয় না?"

কথাটা বলিল সে বেনেতী বুদ্ধির দরক যাকষির চাতুরী বশে নয়, বলিল সে দারিদ্র্যের উঞ্ছ বৃত্তিতে! মেয়েটি কহিল—"কি দেবেন আপনি?"

এতক্ষণে সুখময় আপনার চাতুরীতে খুশী হইয়া উঠিল,—সে কহিল—"আট আনা।"

—"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুখময় কহিল—"আচ্ছা বারো আনা,—আমার কাছে মোট একটা টাকা পুঁজি আছে।"

মেয়েটি কি ভাবিয়া কহিল—"আচ্ছা আসুন।"

শীর্ণ, অপরিষ্কার, অন্ধকার, আঁকাবাঁকা গলিপথ,—একধারে একটা ড্রেন, অপরদিকে খোলার ঘরের চালের প্রান্ত;—মেয়েটি কহিল—"একটু সাবধানে আসবেন, দেখবেন, মাথাটা নীচু করবেন।"

সচকিতভাবে সুখময় কহিল—"কেন?"

মেয়েটি কহিল—"মাথায় লাগ্‌বে।"

—"ওঃ, চলুন।"

মেয়েটি বারান্দায় উঠিয়া একটা ঘরের কুলুপ খুলিতে খুলিতে কহিল—"এই আমার ঘর।"

সুখময় ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই টাকাটা মেয়েটির হাতে দিয়া কহিল—"নেন।"

মেয়েটি টাকাটি লইয়া একটা জাপানী কাঠের বাক্সে রাখিয়া সুখময়কে একটি সিকি দিয়া কহিল—"দেখে নেন।"

সে দেওয়ালগিরির শিখাটি বাড়াইয়া দিল।

সুখময় না দেখিয়াই সিকিটি পকেটে পুরিল। উজ্জ্বল আলোকে সে দেখিল ঘরখানি ছোট মেটে ঘর। চারিপাশেই দারিদ্র্যের একটা জর্জরতা নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একধারে দেওয়ালে কয়েকখানা পট,—কয়েকখানা ছবি। এদিকে একখানা তক্তাপোশের উপর একটা বিছানা; আধময়লা চাদরখানা, পাশাপাশি দুইটা মলিন বালিশ। স্থান, কাল,

পাত্র, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল! এমন ত' সুখময় ভাবে নাই।

সুখময় কহিল—"আপনি একটু বসুন—আমি ঘুরে আসছি।"

সে পা বাড়াইল,—কিন্তু পিছন হইতে একটা আকর্ষণে ফিরিয়া দেখিল—মেয়েটি তাহার কাপড় টানিয়া আছে। সুখময় ফিরিতেই সে কহিল—"আপনি যা দিয়েছেন তা নিয়ে যান।"

সুখময় নীরব হইয়া রহিল। মেয়েটি আবার কহিল—"আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আর আসবেন না।"

সুখময় হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে একটানে কাপড়টাকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে গলির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল—মুক্তি যেন তাহার সুকঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

পিছনে তাহার শব্দ উঠিল—"ঝন্ ঝন্," সুখময় বুঝিল—মেয়েটি পয়সা কয়টা তাহারই উদ্দেশে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল,—একটা কথাও কানে গেল—"আমি ভিখিরী নই।"

কথাটা তীরের মত তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিল,—শরাহত ভীত পক্ষীর মতই সে কাঁপিতে কাঁপিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল। গঙ্গার সিক্তবায়ু বুকের পাঁজরার মধ্যে যেন ব্যথার মত চাপিয়া বসে—সারা পাঁজরাটা যেন কন্ কন্ করিয়া উঠে। নীচে গঙ্গার মৃদু কলকল-জল-চলধ্বনি ক্রমশঃ যেন অস্পষ্ট ক্ষীণ হইয়া আসে।

পরেশ আবার দ্রব্যসম্ভার পাঠাইল—সুখময়ের পত্র সে পাইয়াছে। সেদিন সুখময়ের জীর্ণ ঘরখানির মধ্যে কিন্তু একটা পরিপূর্ণতার আনন্দ-কল্লরোল উঠিতেছিল।

ছেলেদের জুতো জামা, সারদার কাপড়, গরম জামা, একখানি সৌখিন শাল, আরও কত কি! সারদা জিনিসপত্র ঘরে তুলিতেছিল। ছেলে দুইটি নতুন জামা গায়ে দিয়া পরম আনন্দে মায়ের পায়ে পায়ে বেড়াইতেছিল। বড় ছেলেটি বেশ কথা কহিতে শিখিয়াছে, সংসারের অনেক কথা সে বুঝিতে শিখিয়াছে—কহিল—"আজ আর শীত লাগছে না মা!"

সারদা একটি সস্নেহ হাসি হাসিল।

ছেলে উৎসাহভরে আবার কহিল---বেশ চুপি চুপি--"বাবা চলে গিয়েছে, বেশ হয়েছে না মা?---বাবা থাকলে আবার সব ফিরিয়ে দিত!"

সারদার হাতের জিনিসটা পড়িয়া গেল,—সে নির্বাক হইয়া ছেলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল সুখময়কে,—সেও ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু সে বোধহয় এমন কথা জীবনে বলে নাই।

গৌর আসিয়া কহিল—"তোমার অবসর হ'ল দিদিমণি?"

সারদা অন্যমনস্কে বলিল—"এঁ্যা?"

গৌর আবার বলিল,—"বলি অবসর হ'ল তোমার?"

সচেতন হইয়া সারদা কহিল—"কেন, কিছু বলছিলে?"

—"হ্যাঁ, একটা জবর খবর আছে, চিঠিখানা পড়ে দেখ। আমার কিন্তু বখশিস্ চাই মোটা।"

সারদার হাতে চিঠিখানা দিয়া সে হাসিতে লাগিল। সারদা চিঠিখানা পড়িয়া গেল; পরেশ লিখিয়াছে—

"কল্যাণীয়াসু,—

সারু ভাই, সুখময়ের একখানি পত্র পেয়ে যে কি পর্যন্ত সুখী হলাম—তা লিখে আর কি জানাব। সে আমার লিখেছে—'এতদিন পরে

আমার ভুল ভেঙেছে'—আর ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ;—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এ যেন সত্যি হয়,—সে যেন লক্ষ্মীকে চিনে লক্ষ্মীমন্ত হয়। অর্থের আদর না করলে অর্থ আসে না—থাকে না,—তার সম্মান করতে হয় ;—এ সংসারে মিথ্যে ভাবাতিশয্যে অনেক লোক আপনার সর্বনাশ ক'রে থাকে। সুখময়কে সে সব ভ্রম থেকে মুক্ত জেনে পরম আনন্দ হ'ল। আর একটা সংবাদ তোমায় আমি জানাব,—এ সংবাদটি অবশ্য আমার অনেকদিন পূর্বেই জানানো উচিত ছিল ;—বাবা তাঁর উইলে তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা আর আমাদের বৈঠকখানার পাশের সেই একতলা বাড়ীখানি দিয়ে গেছেন। তোমার পঁচিশ হাজার টাকা আজ প্রায় সুদে আসলে হাজার ত্রিশেক হবে,—টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে।

"এ সংবাদটা আমিই এতদিন চেপে রেখেছিলাম তোমারই মঙ্গলের জন্যে—সুখময়ের ভয়েই জানাই নি।—এ টাকাটা হাতে পেলে হয়ত যাকে-তাকে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যর্থ চেষ্টায় সে নষ্ট ক'রে ফেলতো।

"যাক্, আজ তার সুমতি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখন আমার এক পরামর্শ শোন,—তুমি ছেলেদের নিয়ে এখানে এ বাড়ীতে এসে বাস করো। পাকা বাড়ী, তাছাড়া কাছে স্কুল আছে। আর আমার এখানে তোমার বিষয় সম্পত্তি করার সুবিধে হবে,—আমি সব দেখে শুনে দিতে পারব। আর সুখময় যখন চাকরিই করছে তখন আমার এখানে করলেই ত পারে, আমারও সম্প্রতি একজন লোক দরকার, আশী নব্বই টাকা মাইনে। ঘুরে ঘুরে সব ব্যবসা দেখে বেড়াতে হবে ; কিন্তু কেন্দ্র হবে এখানেই। তুমি তাকে একথাটা লিখো। আমাকে তার ঠিকানা জানিও—আমিও তাকে লিখ্‌বো।

"আশা করি যা প্রস্তাব করলাম তাতে তার অমত হবে না। তোমার অমত যে নাই সে আমি জানি। আমি এখানকার বাড়ী ঘর মেরামত করাচ্ছি।

আগামী ২৫শে দিন স্থির করলাম। ঐ তারিখে তুমি ছেলেদের নিয়ে এখানে চলে এসো। আমার আশীর্বাদ জেনো।—

ইতি আঃ তোমার দাদামণি পরেশ।"

চিঠিখানা পড়িয়া রহিল, বোধকরি ভাগ্যের এতবড় আকস্মিক পরিবর্তনে সে মূক হইয়া গিয়াছিল। গৌর কহিল—"তাই চল দিদিমণি, আমি তোমাকে নিয়ে তবে যাব।"

সারদা নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল; সে কোন উত্তর দিল না।

গৌর কহিল—"কি ভাবছ বল তো দিদিমণি?"

এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সারদা কহিল—"ভাবছি।"

গৌর হাসিয়া কহিল—"জামাইবাবুর ভাবনা ভাবছ ত? কিছু ভেব না তুমি, বাবুর উইলের খবর শুনলে তাঁর সব রাগ জল হয়ে যাবে। জান দিদি লটারীতে কে একজন টাকা পেয়ে আনন্দে মরেই গেল।"

গৌর হাসিতে লাগিল।

সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কোন্ উদাস ভাবনায় আবার ডুবিয়া গেল।

গৌর বড় খোকাকে কোলে করিয়া কহিল—"বুঝলে মামাবাবু, কেমন বাড়ী দেখ্‌বে, শোবার ঘরে মার্বেল দেওয়া হচ্ছে, বাবু বল্লেন সারদা ঠাণ্ডা মাটিতে শুতে ভালবাসে; একটা গাড়ী ক'রে দেব তোমায়।"

ছেলেটি কহে—"কোথা?"

গৌর কহে—"নতুন বাড়ীতে, তোমার মামার বাড়ীতে।"

ছেলেটি কহে—"আমাদের ঘর?"

গৌর কহে—"সেও যে তোমাদের ঘর মামাবাবু।"

ছেলেটি প্রতিবাদ করিয়া বলে—'না, এই তো আমাদের ঘর। হ্যাঁ মা—সেও আমাদের ঘর?"

সারদা তেমনি অন্যমনস্কভাবেই কহিল—"হুঁ।"

গৌর মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সে সারদাকে কহিল—"আমার কিন্তু শিরোপা চাই দিদি।"

সারদা নতুন শালখানি গৌরের হাতে তুলিয়া দিল।

গৌর কহিল—"না—না—দিদিমণি—"

সারদা হাসিয়া কহিল—"আমি দিচ্ছি গৌর।"

দিন পনের পরের কথা।

অর্ধ উন্মত্ততার মধ্যে সুখময় কুলিগিরি সুরু করিয়াছিল,—এখনও তাই করে। বস্তীর মধ্যে একটা খোলার ঘর—আরও কয়েক জনের সঙ্গে ভাগে ভাড়া লইয়াছে। বৃত্তিটা মন্দ নয়,—দিনে বারো আনা, একটাকা—কোন কোন দিন বা দেড়টাকা দুই টাকাও উপার্জন হয়। সন্ধ্যার পর আসিয়া দুইটা ফুটাইয়া লইয়া শ্রান্ত দেহে অগাধ নিদ্রা। আবার প্রভাতে উঠিয়া ঝুড়িটা হাতে বাজারের ধারে গিয়া বসিয়া থাকে। সেদিন সন্ধ্যায় ফিরিতেছে, মোড়ের মাথায় একটা হাঁ হাঁ শব্দ, দেখে ঠেঙ্গো বগলে পা কাটা ভিক্ষুক একটা মোটরের ধাক্কায় আছাড় খাইয়া পড়িল। সুখময় কাছে গিয়া লোকটাকে ধরিয়া তুলিল। দেখিল, আঘাত তেমন পায় নাই; ভয়ের বিহ্বলতায় সে কাঁপিতেছে। সুখময় ধরিয়া তাহাকে ফুটপাথের উপর আনিয়া বলিল—"আস্তানা-টাস্তানা আছে তোমার?"

লোকটা তখন হাত মুঠি করিয়া পলাতক মোটরখানাকে শাসাইয়া কদর্য অশ্লীল গালি দিতেছে।—

সুখময় আবার কহিল—"আস্তানা-টাস্তানা আছে তোমার?"

মুহূর্তে লোকটা কাঁদিয়া কহিল—"নেহি বাবা,—শীত্‌মে মর যাতা হ্যায়,—ভুঁখামে মর যাতা হ্যায় বাবা—।"

সঙ্গে সঙ্গে সুখময়কে অজস্র প্রণাম করিয়া ফেলিল। সুখময় কহিল —"এস আমার সঙ্গে।" বাসায় লোকটাকে সেঁকিয়া ফুড়িয়া খাওয়াইয়া পাশে শোওয়াইল। শ্রান্ত দেহে নিদ্রা যেন চোখের পাতায় অপেক্ষা করিয়া থাকে,—দুটি পাতা এক করিবার অপেক্ষা, সুখময় ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা শীতল স্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

অন্ধকার ঘর, এপাশে সঙ্গীরা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে—সুখময় অনুভব করিল—একখানা হাত তাহার অঙ্গ সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, —এপাশে সেই পা কাটা ভিখারীটা তাহার দেহ সন্ধান করিতেছে। সহসা কোমরে একটা টান পড়িল,—সুখময় বুঝিল লোকটা তাহার গেঁজেল কাটিতেছে।

সুখময় যেন পঙ্গু হইয়া গেল ;—এই লোকটাকেই সে আজ পরম যত্নে আনিয়া তাহার সেবা করিয়াছে—খাওয়াইয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে।

লোকটার কাছে হয়ত ছুরিও আছে—বুকে বসাইতেও ত পারে! সে দেখিল লোকটার পিঙ্গল চোখ দুইটা শ্বাপদের মত অন্ধকারেও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

সুখময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা টুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

সুখময় ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাটা গেঁজেলটা টাকার শব্দ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

সুখময় সেটা কুড়াইল.না ; জীবনের একটা শৃঙ্খল যেন তাহার টুটিয়া গেছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিল তাহার ঠিকানা নাই।

আজই খবরের কাগজে সে দেখিয়াছে—"স্বনামধন্য জমিদার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দরিদ্র আত্মীয়া সারদা দেবীকে ত্রিশ হাজার টাকা ও স্বগ্রামে একখানি বাড়ী দান করিয়াছেন। এরূপ আত্মীয়পরায়ণতার নিদর্শন একালে বিরল।"

যাক্ সারদা সুখে আছে—স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব হইতে তাহারা নিজেই তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। একটা কথা তাহার মনে পড়িল—"অর্থে দুনিয়া বিক্রী হয় বন্ধু!" একটা খস্ খস্ শব্দে সুখময় ফিরিয়া দেখিল, খঞ্জটা আবার উঠিয়া বসিয়াছে—মাটিতে বুকে হাঁটিয়া অতি ব্যগ্রভাবে দুই হাতে টাকার গেঁজেলটা হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। পিঙ্গল চোখে তাহার সেই জ্বল্ জ্বল্ দৃষ্টি। তাহার হাতের নখরের ঘর্ষণে মাটির বুকের চটা বোধকরি চিরিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

সুখময় শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ধরণীর বক্ষের উপরের সুশ্যাম চিকন আবরণখানি নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—তাহার চোখের উপর শুধু ভাসিতেছে—ধরণীর বুকের ভিতরের রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, সোনা, রূপা, তামা, লোহা অগণিত ধাতুসম্ভার,—আর তাহাতে প্রতিফলিত দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের লুব্ধদৃষ্টির রক্তাভ ছটা!

সুখময় অনেক ভাবিল, দুনিয়ার উপর কদর্য ঘৃণায় তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। এর চেয়ে এ বেনেতীর কারবারের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকাইয়া ফেলা ভাল; এর সঙ্গে সে খাপ খাইবে না; আপন স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে খাপ খাইল না, বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইবে কিরূপে?

যাক্—পথ ত আছে—অনন্ত বিস্তৃত দুনিয়ার পথ! সেই পথে পথে সে সন্ধান করিয়া দেখিবে—শুধু কি দুনিয়া সোনার তারে গাঁথা? সে স্থির করিল, কাল সন্ধ্যার ট্রেনে সে বাহির হইয়া পড়িবে। রাত্রি এগারোটায় নামিয়া—জীবনের প্রথম তীর্থ তাহার—যেখানে তাহার সহিত এই ধরণীর প্রথম সম্বন্ধসূত্র গ্রথিত হইয়াছে—সেই আপন ভিটেতে প্রণাম করিয়া আনন্দ পাথেয় সম্বল করিয়া অন্ধকারেই আবার সে বাহির হইয়া পড়িবে। জামাটার বুকে সেলাই করা একখানা নোট তাহার আছে!

তারপর দেশ এড়াইয়া পদব্রজে পথে পথে।

এদিকে সুখময়ের জীর্ণ কুটিরে—পথের দিকের জানালাটি খুলিয়া দিয়া, কলিকাতার ট্রেনের অপেক্ষায় সারদা তখনও বসিয়া,—ছেলে দুইটি লেপের ভিতরেও খোলা জানালার হিমপ্রবাহে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে।

কে জানে কেন,—সারদা বাপের বাড়ীতে যায় নাই।

গৌর বলিয়াছিল—"কেন দিদি এমন কষ্ট ক'রে—"

সারদা বাধা দিয়া বলিয়াছিল—"মানুষই দুনিয়ায় এমন কষ্ট করে গৌর! তুমি কি একদিন বল নি গৌর—আমার নাকি মা দুর্গার মত ভাগ্য—রাজরাণী হলেও আমার মান এর চেয়ে বাড়ত না?"

গৌর প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। ট্রেনের শব্দ আর পাওয়া যায় না—সে কতদূর চলিয়া গেল কে জানে!—

প্রদীপের তেল নিঃশেষে পুড়িয়া শিখাটি নিভিয়া গেল। সম্মুখের পথখানি নিবিড় অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল। সারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।—নিত্যই এমনি,—কালও সে এমনি বসিয়াছিল,—আজও আছে,—কালও থাকিবে।

বিরাট কারখানা। ফায়ার ব্রিক্স তৈরী হয়, ফায়ার ক্লে সরবরাহ করা হয়। যুদ্ধের আরম্ভ হতেই কারখানাটি অকস্মাৎ বিন্ধ্যপর্বতের মত কলেবর স্ফীত ক'রে চলেছে। আধুনিক বিন্ধ্য—কোন দুর্বাসার কাছে নত হবে না। বরং বশিষ্ঠের কাছে নত হলেও হতে পারে; হতে পারে কেন, হবে। শান্তিরূপী বশিষ্ঠ যেদিন আবির্ভূত হবেন—সেইদিন সে মাথা নোয়াবে। অর্থাৎ যুদ্ধের শান্তি যতদিন না হবে ততদিন কারখানাটা বেড়েই চলবে। দেশের লোহার কারখানাগুলি দাঁড়িয়ে আছে এর উৎপাদনের ভিত্তির উপর। যুদ্ধবিভাগ থেকে মাল সরবরাহের গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিগ্রামে ওয়াগনের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় রেল স্টেশনটার কর্মচারীরা বরাবরই কারখানার কর্তৃপক্ষকে খাতির করে; সে খাতির এখন বেড়ে গেছে। থানায় সরকারী হুকুম আছে—কারখানার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। কোন অশান্তির সম্ভাবনা মাত্রেই সর্বপ্রকার সাহায্য তৎক্ষণাৎ দিতে হবে। কারখানার ম্যানেজারের মাইনে হাজার টাকা। থানার দারোগা মাইনে পায় একশো পঁচিশ—; খাতির সেও বরাবরই করে; এখন আটশো পঁচাত্তর টাকা বেশী মাইনের ওজনের উপর সরকারী হুকুমের গুরুভার চেপে বসেছে। আগে দেখা হ'লে দারোগা নমস্কার ক'রে বলত—নমস্কার মিঃ বোস!—নমস্কার অবশ্য সম্ভ্রমভরেই করত। কিন্তু এখন সে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভয় মিশেছে; দেখা হলে এখন চকিত ভাবে সে নমস্কার ক'রে বলে—নমস্কার স্যার! আগে নমস্কারের সঙ্গে হাসত; এখন হাসে না। আগে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করত, কিন্তু আজকের অভ্যর্থনায়

সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আজ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আপনি স্যার? আসুন, আসুন, আসুন!

—একটা ডায়রী করতে এসেছি।

—ডায়রী?

—ফণি মিস্ত্রী—, আপনি নিশ্চই তাকে জানেন—সেই বুড়ো মিস্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব জানি। সে তো আপনাদের কারখানার গোড়া থেকেই আছে।

—হ্যাঁ। সেই লোকটা।

—দুর্দান্ত মাতাল।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু পাকা কাজের লোক।

ম্যানেজার হাসলেন।

দারোগা আবার বল্‌লে—ভারি হিতাকাঙ্ক্ষী লোক স্যার, আমি আজ পাঁচবছর রয়েছি এখানে। এমন ফেথ্‌ফুল লোক কিন্তু হয় না।

ম্যানেজার বল্‌লেন—কাল কিন্তু লোকটা কতকগুলো যন্ত্রপাতি চুরি ক'রে পালিয়েছে।

—ফণি মিস্ত্রী চুরি ক'রে পালিয়েছে! দারোগার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—হ্যাঁ, ডায়রীতে আপনি এন্‌ট্রি ক'রে নিন।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন—স্টেশনে যাচ্ছিলাম—পথে ভাবলাম নিজেই ইন্‌ফর্ম ক'রে যাই। অন্য লোকও আসবে। আপনি গিয়ে তদন্ত ক'রে আসবেন।

মোটরের দরজা খুলে ম্যানেজার বল্‌লেন—ইউ মাস্ট ফাইণ্ড দ্যাট ডেভিল আউট। আমরা কোম্পানী থেকে এর জন্যে রিওয়ার্ড দেব।

ফণি মিস্ত্রী। ষাট বৎসর বয়সের প্রৌঢ়; কিন্তু জোয়ানের চেয়ে কম কর্মঠ নয়। কেবল এখন হাঁপ ধরে একটু। বড় বড় মেশিনের দশ পনের মণ ভারী অংশগুলো হাবিসের সময় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধরে যেত। অকস্মাৎ এগিয়ে এসে হাবিসের বোলে বাধা দিয়ে ভেঙিয়ে বল্‌ত—হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! বেটারা সব ভাত খাবার যম। ভাগ্! তারপর সে হাবিসের ডাণ্ডায় কাঁধ লাগিয়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠত। চোখে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ছুটে আসত—মনে হত—রক্ত বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে। পিঠে বুকে হাতে গুল্‌গুলো ফুলে ফুলে দাঁড়িয়ে উঠত পাথুরে অসমতল শক্ত কালো মাটির মত। বিস্ফারিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত দু'পাটি দাঁত—পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে মেসিনের খাঁজ কাটা চাকার মত। প্রকাণ্ড লৌহ-কঙ্কাল শক্তি এবং কৌশল দুইয়ের প্রচণ্ড এবং নিপুণ প্রয়োগে—এগিয়ে চলে যেত পাঁকাল মাছের মত।

ফণি মিস্ত্রী কালও ছিল। সন্ধ্যেবেলাতেও সে পুরনো ইঞ্জিন ঘরে বসে বিড়ি টেনেছে। মধ্যে মধ্যে পকেট থেকে মদের শিশি বের ক'রে খেয়েছে। ঠিক সাড়ে আটটার সময় ক্লাব ঘরে এসে রেডিয়োর সামনে বসে গান শুনে গেছে। অন্যে ঠিক এটা ধরতে না পারলেও ফণি ধরেছিল, সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে কোন না কোন গায়িকাতে গান গায় এবং এটাও সে আবিষ্কার করেছিল—সে গানগুলি রেকর্ডের গান নয়। সুতরাং আপনার মনের তর্ক-যুক্তির অভ্রান্ত বিচারের বিশ্বাসে—রেডিয়োর সামনে গান শুনত আর অনুভব করত গায়িকার সান্নিধ্য; মনে মনে গায়িকার একটি কাল্পনিক মূর্তিও গড়ে তুলত। তালের মাদায় বাহবা দিত। সে বাহবা সে কালও দিয়ে গেছে।

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে এ কারখানার পত্তন হয়েছে। পলাশের জঙ্গল কেটে পাথুরে ডাঙ্গার উপর খাপরায়

ছাওয়ানো তিন কুঠরী একখানা ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, আর প্রকাণ্ড একটা খাপরার চালা—এই নিয়ে কারখানার আরম্ভ। লোকজন বলতে জন-পাঁচেক। কালো প্রকাণ্ড দেহ, আকর্ণবিস্তার মুখ-বিবর, বড় বড় দাঁত, ভাঁটার মত চোখ, ম্যানেজার বাবু, একজন দারোয়ান, একজন কেরাণী-বাবু, একজন মালবাবু, আর ওই ফণি মিস্ত্রী। আরও দু'জন স্থানীয় লোককে জোটানো হয়েছিল। একজন ঠাকুর একজন চাকর। ম্যানেজার বাবু আবার স্থায়ীভাবে থাকতেন না। সপ্তাহে তিন দিন—শুক্র, শনি, রবি; বৃহস্পতিবারে রাত্রে এসে তিনটে দিন হৈ-চৈ, 'হুড়ুম-ধারুম', তৈরী জিনিস ভেঙ্গে, নতুন জিনিসের ফরমাস দিয়ে, মদ পাঁঠা খেয়ে—সোমবার সকালে আবার রওনা দিতেন। তখন ফণিই ছিল এখানকার সর্বেসর্বা। লেখাপড়া যেটুকু জানত সেটুকু না-জানাই; মোটা মোটা আঁকা বাঁকা অক্ষরে অতি প্রয়োজনে ম্যানেজারকে নিজে হাতে গোপন-পত্র লিখত—"সিচরনেশু, এখানকার কাজে একটা বেপার হইয়াছে, পাশের সায়েব কোমপানী খুব চুলবুল লাগায়েছে। আমাদিগে ইথান থেকে ভাগাবার মতলব। আপুনি শীঘ্র আসিবেন। সাক্ষাতে সব বলিব। মালবাবুর গতিক সতিক সুবিধের লয়। আসিবার সময় হরিনারান বল্টু গণ্ডাকয়েক এবং শক্ত ফিতা আনিবেন।" নীচে নাম সই করত, কিন্তু ইংরাজীতে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখত পি, মিস্তিরী। অবশ্য বোঝা যেত না, কারণ সইটা এমন টেনে করত যে, মনে হত ওটা কোন হিজিবিজি অথবা কোন পাকা বড় সায়েবের সই।

'হরিনারান বল্টু'—হোল্ডিং নাট বোল্ট। ফিতা—বেল্টিং। বাংলার যে সব জেলা এখন বেহারের মধ্যে ঢুকেছে সেই সব কারখানা-প্রধান অঞ্চলের শ্রমিকদের এগুলি নিজস্ব ভাষা। এমন কথা অজস্র—শ্যাফ্‌ট্‌—শাপ্টু, ট্রলি—টালি, ভাল্‌ভ—ভালবু, গেজ কর্ক—গজ কাক্‌, হ্যামার—হাম্বর ইত্যাদি।

এই 'হাম্বর' পিটতেই সে প্রথম ঘর ছেড়ে এসেছিল কারখানার কাজে, কারখানা পত্তনেরও পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে। জাত কামারের পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই বেশ শক্ত সমর্থ দেহে ছেলেটি এসে কাজ নিয়েছিল একটা কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর কামারশালায় এসে ভর্তি হয়ে শুনলে—হাতুড়ির নাম 'হাম্বর'। কলিয়ারীটা এই কোম্পানীরই কালিয়ারী। কিন্তু তখন কোম্পানী ছিল চিঠির কাগজের মাথায় ছাপানো নামে। মালিক বাবু আসতেন দশাশয়ী পুরুষ, আমীর লোক, সঙ্গে আসত ফলমূল, তরি-তরকারী, কেসবন্দী বিলিতী মদ, বেতের খুপ্‌রীওয়ালা বাক্সে সোডা; শীতকাল হ'লে গলদা চিংড়ী, বর্ষা হলে ইলশে মাছ, ছোট ছেলের মাথার খুলির মত কাঁকড়া। কলিয়ারীর নাম ছিল কুঠি; কুঠিতে সমারোহ পড়ে যেত। প্রতি মালকাটার দলে পেত খাসী এবং মদের দাম; বাবুদের মেসে হ'ত 'ফিষ্টি'; তারা মালিকবাবুর আনা জিনিসের ভাগ পেত, আরও মঞ্জুর হ'ত খাসীর দাম। ম্যানেজার বাবুর বাংলায় মালিক বাবুর আসর পড়ত। যাবার সময় বক্‌শিসের ছড়াছড়ি। আট আনা থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ টাকা পর্যন্ত।

চার বৎসর পরে সে মালিক-বাবুর সুনজরে পড়েছিল। তখন সে আর হাম্বর পিটত না। তখন সে ছোট মিস্ত্রী। তার গুরু বড় মিস্ত্রী তখন প্রায় বসে থাকত। ফণিকে বাহবা দিত! ফণি খাটত দৈত্যের মত। গুরুকে কোন কাজ করতে দিত না। প্রৌঢ়ও তাকে খুব ভালবাসত। তার বিদ্যা বুদ্ধি অকপটভাবে সে ফণিকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিল। শুধু তার যন্ত্রবিদ্যাই নয়—তার স্বভাব চরিত্র জীবন-দর্শন সব ফণিকে দিয়েছিল। ইঞ্জিন বয়লার, পাম্প, শ্যাফ্‌ট্‌, পুলি প্রভৃতির নাড়ী নক্ষত্র তাকে চিনিয়েছিল অদ্ভুত-ভাবে। খোলা ইঞ্জিনের অংশগুলি জুড়ে বয়লারের ষ্টীম পাইপের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, বাষ্পশক্তির পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে বলত—দেখ!

ইঞ্জিনের কাজ আরম্ভ হ'ত, ঝক্ ঝকে তৈলাক্ত লৌহদণ্ডটা চলতে আরম্ভ করত, সঙ্গে সঙ্গে বড় চাকাটার সঞ্চরিত ঘূর্ণমান গতি; প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে; চাকায় আবদ্ধ বেল্টিং-বন্ধনের টানে অন্য চাকাগুলোও ঘুরত, দেখতে দেখতে টিনের শেডের অভ্যন্তরভাগ শব্দায়মান হয়ে উঠত, যন্ত্রগুলোর গতিশীলতার শব্দে, তার বেগে মাথার উপরে টিনের চালায় কম্পন সঞ্চারিত হ'ত, পায়ের তলায় বাঁধানো মেঝেও কাঁপত থর থর ক'রে। আবার সে ব্রেক কষত অথবা বাষ্পশক্তির পথ বন্ধ ক'রে দিত, ইঞ্জিনটাও ধীরে ধীরে থেমে আসত। ফণি অবাক হয়ে দেখত!

ধীরে ধীরে সব সে শিখলে। ছোট একটি বোল্ট আল্‌গা থাকলে—কেমন কেমন শব্দ ওঠে—শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ পাকা সেতারীর স্বরবোধের মত পাকা হয়ে উঠেছিল। নানা লৌহযন্ত্রের রূঢ় উচ্চ শব্দ-সমন্বয়—সে যেন এক বিরাট ঐক্যতান বাদন, অথবা বিরাট লৌহ সেতারের বহুসংখ্যক তারের ঝঙ্কার। শুনবামাত্র কোন্ তারটিতে বেসুরা সুর উঠেছে, সেটিকে কতখানি টান ক'রে বাঁধতে হবে বা আল্‌গা করতে হবে—গুরুর শিক্ষায় ফণি সেটা বুঝতে পারত মুহূর্তে। আরবের শেখ যেমন ঘোড়া চেনে, এ-দেশের চাষীরা যেমন গরু চেনে, তেমনি চেনবার শক্তিতে গুরু তাকে মেশিন চিনতে শিখিয়েছিল। দেখবামাত্র সে বলতে পারত—কত ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন অথবা কত ঘোড়ার জোর ছিল, এখন ঘষে ক্ষয়ে কত ঘোড়ার জোর দিতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে শিখিয়েছিল মেশিন কেনাবেচার কমিশন নেবার কৌশল।

আর শিখিয়েছিল—মালিক অন্নদাতা প্রভু, মা-বাপ। ম্যানেজারকে সেলাম বাজাবে, কমিশনের ভাগ দেবে ডালি দিয়ে, কিন্তু জানবে ওই

হ'ল আসল সয়তান। মালিক চাকরী দেয় ম্যানেজার চাকরী খায়। কসুর হ'লেও মালিক মাফ করে; যত ভাল কাজ তুমি কর—ম্যানেজার নিজের নামে চালায়।

আর শিখিয়েছিল মদ খেতে। বলেছিল—এ হ'লো 'ইস্টীম'। মদের বোতলের ছিপি খুলে বলত—খোল্ 'এস্টপ কাক', চালাও ইস্টীম, শা-লা—দশ ঘোড়ার ইঞ্জিন চলবে বিশ ঘোড়ার কদমে।

নিজে খেয়ে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত—লে ব্যাটা—ইস্টীম কর্ লে। উৎসাহে সে হিন্দী বলত।

আর শিখিয়েছিল—নারীর চেয়ে ভোগ্য আর কিছু নাই। বলত—দেখ-না চেয়ে দেখ।

মালিক—ম্যানেজার, বাবুরা, দারোয়ান, কে বাদ আছে?

নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে রাণীগঞ্জে বেশ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই শ্রেণীর একটা বাড়ীতে গিয়ে সে বাড়ীর সমস্ত মেয়েগুলিকে ডেকে সামনে সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে বলেছিল—বল তোর কাকে পছন্দ?

আর শিখিয়েছিল—ক্ষতি করতে হয়—উপরওয়ালার করবি। কিন্তু গরীবের ক্ষতি কখনও করবি না। কভি না। গরীব চুরি করছে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি। বসে থাকিস ত ফিরে বসবি। খবরদার ক্ষতি করবি না। তবে তুই আর ওই শালা ম্যানেজারে তফাৎ কি?

এই কারখানা সে নিজে হাতে গড়েছিল। সে আর ইটমিস্ত্রী বুড়ো এনায়েৎ খাঁ। কারখানার যন্ত্রপাতি, শেড তৈরীর বীম, র‍্যাফ্টার অ্যাঙ্গেল, টি,—বোল্টনাট এনে কাজ আরম্ভ করেই—বুড়ো এনায়েৎকে নিয়ে আসে। নিয়ে এল ঐ পাশের সায়েবদের কারখানা থেকে ছাড়িয়ে। পাকা দাড়ী পাকা চুল, মাথায় পাগড়ী বেঁধে সায়েবদের কারখানায় বুড়ো বয়েসেও

এনায়েৎ ছোট মিস্ত্রী হয়ে কাল কাটাচ্ছিল। এদিকে এখানে 'চিন মাটির' কারখানা—সে কাজ সে জানে না। রাক্ষুসে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে সেদিন এসেছিলেন মালিক বাবু। প্রকাণ্ড বড় একটা খাসী সন্ধ্যের আগেই পড়ে গিয়েছে। এক ইঞ্চি পুরু চর্বিতে ছোট গামলাটা ভরে উঠেছে। বেঁটে ছোট্ট মোটা বিলিতী হুইস্কীর বোতল খুলে বসেছেন দু'জনে! ফণির ডাক পড়ল।

প্রণাম ক'রে হাত জোড় ক'রে বসেছিল।

এত বড় খাসীটার একটা লম্বা মোটা হাড় ম্যানেজার কষের দাঁতে টিপে ভাঙছিল মড়মড় ক'রে। বড় বড় চোখ দুটো কুঁচের মত লাল হয়ে উঠেছে। বাবু বসেছিলেন গম্ভীরভাবে।

কেউ কিছুই বলেন নাই। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে ফণিই বলেছিল—হুজুর!

মালিক মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন—ইঁট মিস্ত্রী চাই। এক হপ্তার মধ্যে।

ফণি বলেছিল—আমি চেষ্টার কসুর করছি না হুজুর।

—এক হপ্তার মধ্যে চাই।

খাসীর হাড়টা ম্যানেজারের দাঁতের মধ্যে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। তিনি বলেছিলেন—ব্যাটার মাথা চিবিয়ে খাব নইলে।

ফণি মাথা চুল্‌কে বলেছিল—দেখি আজ্ঞা।

মালিক অভয় দিয়েছিলেন—টাকার জন্যে ভাবিস নে।

—যে আজ্ঞে। ফণি প্রণাম ক'রে উঠে বলেছিল—কালই দেখছি আমি।

—দাঁড়া।

—আজ্ঞে।

—ওইটে নিয়ে যা। বোতলটা।

আর একটা প্রণাম ক'রে বোতলটা নিয়ে সে বেরিয়ে এসে সেদিন মদ খেয়ে নেচেছিল। মালিক তাকে মদের প্রসাদ দিয়েছেন। বিলিতী মদ। কি তার! কি নেশা!

পরের দিনই সে সায়েবদের কারখানা থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এল একটা সুন্দরী যুবতী কামিনকে। মেয়েটা এনায়েতের অনুগৃহীতা।

তার পরের দিন এনায়েৎ এল দাঙ্গা করতে।

ফণি দারোয়ানকে বসিয়ে দিলে বন্দুক নিয়ে। দাঙ্গা হ'ল না, বচসা হ'ল। শেষ পর্যন্ত ফণি গাঁজার কল্কে সেজে বল্‌লে—হাঙ্গামায় কাজ নাই, তুমি এইখানে এস, এখানকার বড় মিস্ত্রী হবে তুমি, ওখানকার চেয়ে দশ টাকা মাইনে বেশী পাবে। আর ও কামিনটাকে কাজ করতে হবে না,—তোমার ঘরে থাকবে। তার হাজরি পাবে।

এনায়েৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

ফণি গাঁজার কল্কে দেখিয়ে এবার আহ্বান জানালে—এস, বস, খাও।

এনায়েৎ এল, বসল—গাঁজা খেলে। পরের দিন গভীর রাত্রে এনায়েৎ এসে হাজির হ'ল—আরও দুই বিবি নিয়ে; এই কারখানার গাড়ীতে বোঝাই হয়ে এল তার মালপত্র।

তারপর কারখানা চলতে লাগল—দ্রুততম গতিতে। ভাটার পর ভাটা। তৈরী করালে এনায়েৎ। ফণি বয়লার বসালে, ইঞ্জিন বসালে, নিকটের নদীটাতে পাম্প বসালে, মাটি গুঁড়ো করবার জন্যে গ্রাইণ্ডিং মেশিন বসালে, ম্যানেজার তাকে বই থেকে ছবি দেখালেন—সে তাই দেখে তৈরী করলে কত হাত-গড়া যন্ত্র। কাঠের মিস্ত্রীকে দিয়ে বসে থেকে তৈরী করালে হরেক রকমের ছাঁচ। চালু হ'ল কারখানা। কালো মাটির তৈরী জিনিসগুলো পুড়ে মাখনের রং নিয়ে বজ্রকঠিন হয়ে বেরিয়ে

আসতে আরম্ভ হ'ল। প্রথম যেদিন ভাটা পুড়ে মাল খালাস হ'ল সে দিন ফণির আনন্দের আর সীমা ছিল না।

সেদিন সে মদ খেয়ে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মেশিন—ওই ইঞ্জিনটার উপর শুয়ে সেটাকে চুমো খেয়ে—পিঠ চাপড়ে আদরের আর বাকী রাখে নাই।

ফণি মিস্ত্রী ছিল কারখানার সর্বে-সর্বা। কারখানাটার সমস্ত ছিল তার নখদর্পণে। বড় বড় যন্ত্রপাতি থেকে ছোট্ট সূচটির হিসাব পর্যন্ত তার মনে ছিল। গুদোমের হিসেব মিল্‌ছে না। নতুন একটা 'পারালেবেল' নাই, কয়েকখানা ট্রলি লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, কতকগুলো নতুন ইঞ্জিন পার্টস এসেছে—সেগুলো নাই, সর্বপ্রথমে যে পাম্পটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও কোথায় উধাও হয়েছে। গুদামবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল। ছা-পোষা মানুষ—সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে, বুকের পাটা অত্যন্ত কম, তার ওপর ম্যানেজার বসিয়ে দিলেন তার কোয়ার্টারের দরজায় দারোয়ান। ফণি ছিল না। সে গিয়েছিল রাণীগঞ্জ। কাজ কোম্পানীর—একটা কলিয়ারীতে কিছু লোহালক্কড়ের সন্ধানে পাঠিয়েছিল তার গুরু। সে চার দিনের জায়গায় আট দিন কাটিয়ে এল। বিক্রেতার কাছে কমিশন পেয়েছিল—প্রায় একশো টাকা, সে টাকাটার আর অবশিষ্ট আছে কুড়ি টাকা কয়েক আনা। এ ছাড়া কোম্পানীর কাছে রাণীগঞ্জ যাওয়া-আসা এবং থাকার বিল হয়েছে পঁচিশ টাকা। যে মেয়েটির বাড়ীতে সে ছিল, তাকে সে একখানা গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, খুব দামী অবশ্য নয়—তবু পঞ্চাশ টাকা লেগেছে।

সে এসে দেখলে কারখানায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। খোদ মালিকবাবু পর্যন্ত কলকাতা থেকে এসে হাজির। গুদামবাবুকে পুলিশে দেওয়া হবে কি না তারই সমালোচনা চলছে। কলকাতা আফিসের ম্যানেজার এসেছেন,

তিনিই চান পুলিশে দিতে। তিনি একেবারে সায়েব মানুষ; দয়া-মায়া পুরনো চাকর এ সব কথা হলেই বলেন—রাবিশ।

ম্যানেজারবাবু বলছেন—বেটাকে ঘরের মধ্যে পুরে দে দমাদম্।

মালিক চুপ করেই আছেন।

ফণি এসে সব শুনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। বল্লে—দেখি আজ্ঞা আমি একবার মিলায়ে দেখি। তবে পুরানো পাম্পটার কথা বল্ছি—সিটাতে তো কিছু ছিল না।

কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন—কিছু ছিল, না ছিল তো কথা নয়। জিনিসটা গেল কোথায়?

—আজ্ঞা যাবে কোথা? নতুন পাম্প্ এল—সিটা তুলে এনে ওইখানে ফেলা হয়েছিল,—নতুন বাংলার ভিত কাটার সময়—মাটি তুলে ফেল্লে, মাটি চাপা পড়েছে। খুঁড়লেই মিলবে।

কথাটা এবার ম্যানেজারেরও মনে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পাম্পটা ঠিকই পাওয়া গেল।

—ইঞ্জিন পার্টস্?

—সে তো আজ্ঞা ইঞ্জিনে লাগানো হয়েছে। একেবারে ইস্টিশান থেকে ইঞ্জিন শেডে মাল খুলে আমি লাগিয়েছি।

ম্যানেজার, মালিক এবং কলকাতা আপিসের ম্যানেজারকে নিজে গিয়ে ইঞ্জিনে লাগানো অংশগুলো বিলিতী মার্কা মিলিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—পুরনোগুলো?

—সেগুলা দেখছি আজ্ঞা।

—ট্রলি লাইন?

—সি লাগানো আছে নতুন শেডে। ক'খানা টি-য়ের অভাব পড়ল কি করব, পড়েছিল লাগায়ে দিলাম। ম্যানেজার বাবুকে বলেছিলাম।

ম্যানেজারের মনে পড়ল এবার।—হ্যাঁ বটে।

—এখন ইঞ্জিনের পুরনো পার্টসগুলো আর পারা-লেবেল।

—দেখি আজ্ঞা খোঁজ ক'রে।

গুদামবাবুকে সঙ্গে ক'রে সে বেরিয়ে এল। গুদামবাবু হাত চেপে ধ'রে বললেন—মিস্তিরী আমাকে বাঁচাও।

—বাঁচাও! ইঞ্জিনের সেগুলা করলি কি? আমি যে তুর গুদামে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বোঝ ক'রে দিয়েছি।

—আমার মেয়ের বিয়ের সময়—। গুদামবাবু আর বলতে পারলে না, কেঁদে ফেললে।

—হুঁ। কত টাকায় বেচেছিস? কাকে বেচেছিস?

—ওই মাড়োয়ারী স্টোর সাপ্লায়ার্সের কাছে—পাঁচশো টাকা ধার করেছিলাম। টাকার জন্যে তাগাদা করে—বললে নালিশ করব। সে ই সেগুলো নিয়ে গেছে। দাম এখনও ঠিক হয় নি।

—হুঁ। পারালেবেলটা চুরি করেছে—ইব্রাহিম রাজমিস্ত্রী—আমি জানি। কিন্তু খবরদার বলবি না। তা হ'লে তুর মাথাও খেয়ে দিব আমি। এই টাকা লে—একজনা কাউকে দে পাঠায়ে বাজারে। নিয়ে আসুক কিনে।

সন্ধ্যায় পারালেবেলটা হাতে করে হাজির হয়ে বললে—আজ্ঞা ইটা ছিল ইব্রাহিমের কাছে। তাড়াতাড়ি আমি নিয়ে গিয়েছিলাম গুদাম থেকে, তখন উদিকে ইঞ্জিন বসছে। কাজ সেরে দিলাম ইব্রাহিমকে—বেটা গাধ—নিজের কাছেই রেখেছিল।

—ইঞ্জিন পার্টস্?

মাথা চুলকিয়ে ফণি বলল—মড়ার হাড়—ইয়ের হিসেব কি মেলে? নতুন জিনিস এল পুরানো রদ্দিগুলা ছাড়ায়ে ফেললাম। ইঞ্জিন ঘরের আশে-

পাশে পড়েছিল অনেক দিন, তা খুঁড়লেও মিলতে পারে। আবার কুলি কামিনে নিয়েও যেতে পারে।

মালিকের হাতে তখন গ্লাস। কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন—তার দাম তা হ'লে তোমাকে লাগবে।

—তা যখন অন্যায় করেছি তখন দিতে হবে আমাকে।

মালিক গ্লাসটা শেষ ক'রে বল্লেন—ম্যানেজার বাবু, ফণি মিস্ত্রীকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস। এখুনি দিয়ে দিন।

একটা প্রণাম ক'রে ফণি বললে—হুজুর, গরীব গুদাম বাবুর বেটির বিয়াতে পাঁচশো টাকা ধার হয়েছে। গরীব বিনা দোষে—।

সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মালিক বললেন—দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও ওর।

হঠাৎ যেন কাল পাল্টে গেল। অন্ততঃ ফণির তাই মনে হ'ল। ১৯৩০ সালের স্বদেশী হাঙ্গামার মাতন তার মন্দ লাগে নি! সেও খদ্দর পরেছিল, দোকানে মদ কেনা বন্ধ ক'রে দিয়ে নদীর ধারে মদ চোলাই শুরু ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে সব হাঙ্গামা থেমেগিয়ে হঠাৎ কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গেল।

ফণি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কোন্ দিকে সে যোগ দেবে বুঝতে পারলে না। প্রথম যেদিন মিটিং হয় সে দিন ভুলু সিংগী, হতভাগা তারই কাছে কাজ শেখে, তাকেই দিলে সভাপতি ক'রে। প্রথমটা মন্দ লাগল না ফণির। চেয়ারে ব'সে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে বেশ বুক ফুলিয়ে বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ফণি চঞ্চল হয়ে উঠল। যে লোকটি মিটিং করার জন্য এসেছে—সে এসব কি বল্ছে? মালিকদের আমরা এতদিন বলে এসেছি—মা-বাপ, হুজুর-মালিক। ভেবে এসেছি ওরাই আমাদের খেতে পরতে দেয়। এটা এতদিন ধরে ওরাই আমাদের বলিয়ে এসেছে;

পাঠশালার গুরুমশায় যেমন অ-আ মুখস্থ করায় তেমনি ক'রে মুখস্থ করিয়েছে। মালিক মা-বাপ নয়, হুজুরও নয়, কারখানার মালিক হ'লেও আমার মালিক সে নয়। সে আমাকে খেতে পরতে দেয় না। আমরা যা খাই, ছাতু-নিমক, আটা-দাল, ভাত তরকারী—তার একটা দানাও সে আমাকে মেহেরবানী ক'রে দেয় না। সে-ই আমার খানার ভাগীদার;—আমার রোজগারের দানায় সে ভাগ বসায়—আমায় ভুল বুঝিয়ে—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে। তোমরা ভেবে দেখ,—আমরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কি হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটি! বয়লারে কয়লা ঠেলি—ইঞ্জিন চালু রাখি—মেশিনে-মেশিনে কাজ করি। ভাটার আগুন-তাতে ঝলসে যাই, পেট-ভর্তি ধুলো খাই—সর্বাঙ্গে কাদা মাখি; আমরাই এই কারখানায় খাটি—তবে মাল তৈরী হয়। আর সেই 'মাল' বিক্রী ক'রে মালিক মুনাফা করে লাখো-লাখো টাকা। সে খায় পোলাও, কালিয়া, পরে ফিন্ ফিনে ধুতি, গলায় উড়োয় রেশমী চাদর! দামী জুতো পায়ে দিয়ে মস্-মস্ ক'রে চলে; মটর গাড়ীতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, দোতলায় শোয়—দিন দিন সিন্দুকে জমায় হাজারে হাজারে টাকা। সে সমস্তই তারা করে—আমাদের দানা মেরে। অথচ আমরা কিছু বললেই ওরা আমাদের বলে বেইমান। ইমান আমাদের ওদের কাছে কি আছে? নিমক আমরা ওদের খাই না। ভগবানের, খোদাতালার দেওয়া আমার তাগদ্—সেই তাগদে আমি মেহন্নত করি, সেই মেহন্নতের রোজগার যারা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে নেয়—তাদের কাছে আমাদের কিসের ইমান? বেইমান তারা।

সভাপতির আসনে বসে ফণি ঘেমে সারা হয়ে গেল। এমন ধারার কথা উঠবে সে ভাবে নাই। চিরকাল সে মালিককে মনিব জেনে এসেছে; তার গুরু তাকে শিখিয়ে গেছে মালিক মনিবের ক্ষতি কখনও করবি না; মালিকের বকশিস নিয়েছে; তার প্রসাদী মদ খেয়েছে; তার আদরের

হারামজাদা' গালাগাল শুনে খুশী হয়েছে—তার মধ্যে সে স্নেহের সন্ধান পেয়েছে; তাদের সম্বন্ধে লোকটি এ কি বলছে? সে আজ সভাপতি না হলে সে-ই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলত। মালিকরা শুনলে কি বলবেন? তা' ছাড়া লোকটা কিছু জানে না। টাকা কার? আর বেশী চালাকী করলে মালিক যদি এঁটো ভাতের কুত্তার মত এদের তাড়িয়ে দেয় তবে এরা যে না খেয়ে মরবে!

সভাপতির আসন থেকেই সে বললে—ই-সব কথা আপনি ভুল বলছেন মশায়!

বক্তা থেকে সভার সকলেই একটু সচকিত হয়ে উঠল।

ফণি বললে—মশাই কারখানা গাছের মতন মাটি থেকে আপনি গজায়ে উঠে নাই। টাকা লেগেছে কাঁড়ি কাঁড়ি! মালিক সেগুলা আগাম ঘর থেকে বার করেছে।

বক্তা হেসে বললে—কারখানা যেমন মাটি থেকে আপনি গজানো গাছ নয়, টাকাও তেমনি গাছের ফল নয়। মাটিতে ঝরে পড়েছিল না; মালিক কুঁড়িয়ে এনে ঘরে জমান নাই। ঘরে তিনি তৈয়ারীও করেন নাই। সে টাকাও তিনি জমিয়েছেন—এমনি কোন পুরনো কারখানার মুনাফা থেকে। গরীব মজদুরের মেহন্নতের মজুরীতে জবরদস্তি ভাগ বসিয়ে।

ফণির মনে পড়ে গেল বাবুর পুরনো কয়লা কুঠির কথা। হাঁ—বাবু সেইখান থেকেই বড়লোক বটে। কিন্তু—কিন্তু—তবু তার বাবুকে—মনিবকে এমন ক'রে খারাপ কথা বলতে পারে না।—মনিবের শক্তি—হিম্মৎ জানে না। সে বলে উঠল—ই-সব কি কথা বলছেন আপনি—কুলিগুলানকে ক্ষেপায়ে দিছেন; কুলিরাই কল চালায়—হাঁ—ই-কথা ঠিক বটে। কিন্তু মালিক যখন কাল খেদায়ে দিবে সব, তখন কি হবে?

বক্তা হাসলে। বললে—মালিকের কারখানাও তা' হলে বন্ধ হয়ে যাবে! মুনাফাব চাকা ঘুরবে না।

ফণিও হাসলে—বললে—ইদিগে তাড়ায়ে মালিক নতুন লোক আন্‌বে। তখন?

—নতুন লোকেরাও কুলি। আপনারাও আজ যা বলবেন—কাল তারাও এসে তাই বলবে। দুনিয়ার মজদুর যদি এককাট্টা হয়ে যায়—তখন? তখন কি করবে কারখানার মালিক? কথা তো তাই। সব এককাট্টা হো যাও। এ কারখানার একজনকে তাড়ালে যদি সবাই চলে যায়, সবাই চলে গেলে দুনিয়ার মজুর যদি না আসে, তবে? তবে?

ফণি হতভম্ব হয়ে গেল। সভায় উপস্থিত কুলিরা হৈ-হৈ ক'রে উঠল—ঠিক বাত, ঠিক বাত!

বক্তা বললে—আমাদের মজুরী বাড়াতে হবে।

—আলবৎ!

—আমাদের খাটুনীর সময় কমাতে হবে।

—জরুর।

না হলে আমরা ধর্মঘট করব!

—জরুর! আলবৎ!

সভার মধ্যে সেই ছোঁড়া ভুলু সিংগী, যাকে সে হাতে ক'রে মানুষ করেছে—সে-ই তাকে—বুড়ো—বাতিল সেকেলে লোক বলে গাল দিলে। বললে, বাঘকে বাচ্চা অবস্থায় ধরে প্রতিদিন মানুষ আদর ক'রে আফিং খাওয়ায়—সারাটা জীবন সে ভুলেই থাকে যে সে জঙ্গলের আমীর—রাজা। সে শুধু আফিংয়ের নেশায় ঝিমোয় আর ভাবে আফিং জোগানে-ওয়ালাই তার ভগবান; তার হাত চাটে। আমাদের মিস্ত্রী সাহেবের সেই নেশা লেগে আছে।

লোকে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। ফণির মাথা হেঁট হয়ে গেল। কারখানার ভেতর হলে সে একটা লোহার ডাণ্ডা ছোঁড়াটার মাথায় বসিয়ে দিত।

ছোঁড়া কিন্তু চালাক। সে ফণিকে জানে। ফণি বেশ বুঝতে পারলে তার চালাকী। এই হাসিতে ছোঁড়া চীৎকার ক'রে বলে উঠল—খবরদার! হেসো না তোমরা। এ হাসির কথা নয়। মিস্ত্রী সায়েব আমাদের সত্যি-সত্যিই বাঘ। তার হিম্মৎ, তার কিম্মৎ কত তোমরা জান না। ওই বাঘকে আফিংয়ের নেশা ছাড়াতে হবে; তারপর ওই বাঘকে সামনে রেখে আমরা করব লড়াই। বলো ভাই—ফণি-মিস্ত্রী কি—

লোকে চীৎকার ক'রে উঠল—জয়।

কারখানায় ধর্মঘট হ'ল।

পুরনো মালিক মারা গেছেন। টেলিগ্রামে পুরনো ম্যানেজার বাতিল হয়ে গেল। এলেন নতুন মালিক, নতুন ম্যানেজার। কাঁচা বয়েস, খাঁটি সায়েবী মেজাজ, চোস্ত ইংরিজীতে কথাবার্তা; এসেই ডাক দিলেন কুলীদের মাতব্বর ক'জনকে। মাতব্বরের মাথা সেই ছোঁড়া সিংগী। ফণিকে তারা ডাকলে না। ফণি মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মালিক-ম্যানেজার মিটমাট ক'রে ফেললেন মজুরদের সঙ্গে।

সন্ধ্যের পর ফণি গেল বাংলায় দেখা করতে। প্রণাম ক'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল। নতুন মালিক বললে—কি চাই?

ফণি বললে—আজ্ঞা আমি ফণি-মিস্ত্রী।

—জানি। কিন্তু দরকার কি তোমার?

ফণি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজার বললে—তুমিই তো মজুর সভার সভাপতি?

ফণি জোড়হাত করেই বললে,—আজ্ঞে হাঁ।

—কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে তোমাদের ডেপুটেশনের লোকদের সঙ্গে। শুনেছ ?

—আজ্ঞা—না।

—তাদের কাছেই শুনতে পাবে। কাল থেকে কাজ আরম্ভ হওয়া চাই। যাও।

কাজ আরম্ভ হওয়ার নামে ফণি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—আজ্ঞা হাঁ। জরুর। এখুনি যাই আমি।

বেরিয়ে এসে কারখানার ধারে সে দাঁড়াল। কত আলো জ্বলে কারখানায়—সেই কারখানাটা অন্ধকার হয়ে আছে। এখানকার প্রতি ইঞ্চি জমি তার জানা, তার হাতের তৈরী এই শেড ;—প্রতিটি মেসিন সে-ই বসিয়েছে—তারও এ অন্ধকারে পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে। কত শব্দ কারখানায়। বয়লারের স্টীমের শব্দ, ঠিক তালে তালে ইঞ্জিনের শব্দ, বেল্টিংয়ের ঘোরার শব্দ, ঘূর্ণিত শ্যাফ্‌টগুলোর শব্দ, গ্রাইণ্ডিং মেশিনের শব্দ, এই মহা ধ্বনির আঘাতে শেডের টিনের কম্পন-ঝঙ্কার—সব স্তব্ধ। এই সব বিচিত্র শব্দগুলির মধ্যে কোন একটি শব্দ, সে বয়লারের স্টীমের শব্দ বা শ্যাফ্‌টগুলোর ঘূর্ণনের ধাতব ধ্বনি—কিম্বা টিনের চালের ওই ঝঙ্কারের মধ্যে বেজে ওঠে যে বাজনার স্থর, সেই স্থরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুলি-কামিনে কতজনে কত গান করত ; সে সব আজ চুপচাপ। পূজোর পর প্রথম প্রথম রাত্রে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ খাঁ-খাঁ করে—কারখানাটাওসেই রকম খাঁ-খাঁ করছে। সব তার নিজের হাতের গড়া। ধর্মঘটের প্রথম দিন কারখানার এই স্তব্ধতা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত ক'রে তুলেছিল, সে অধীর হয়ে কারখানায় যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়া ঢুলু সিংগীই তাকে যেতে দেয় নি। সে পা দিয়েছে কারখানার ফটকে, অমনি পিছন থেকে টান পড়ল—কে ?

ভুলু বললে—আমি। আমাদের ছেড়ে যাবে তুমি মিস্ত্রী ? এতগুলো লোকের রুটি।

মিস্ত্রীর মনে হ'ল সব গরীবের মুখ। কারখানায় ঢুকতে সে পারে নি।

পরদিন ভোর বেলায় কারখানায় ফণি এল সর্বাগ্রে। বয়লারের ফায়ার-ম্যানটা আসতেই ধমক দিয়ে বললে—এত দেরী করে ? নে, আর কয়লা। জলদি স্টীম উঠাও।

সে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রইল স্টীমের চাপ নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে। ঘড়ির কাঁটার মত কাঁটাটা, থর থর ক'রে কাঁপছে। ফণির দেহের মধ্যে রক্ত-স্রোত চঞ্চল হয়ে উঠছে। তার নিজের হাতের গড়া কারখানা। ইঞ্জিনের চালকটাকে ঠেলে দিয়ে সে নিজে বসল চালাবার জায়গায়, ঐরাবতের মাহুতের মত।

স্টীম এসে ঠেলা মারছে। সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পশক্তি বর্ষার আকাশের ক্রমবিস্তৃত-কলেবর পুঞ্জিত মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছে। ধাক্কা খেয়ে পিস্টনের ঠেলায় প্রকাণ্ড বড় লোহার চাকাটার সঙ্গে আবদ্ধ লোহার দণ্ডটা নীচে থেকে উপরে উঠছে—চাকাটা নড়ছে। চলবে—এইবার চলবে।

সিংগী ছোঁড়া এল। হেসে বলল—সেই ভোরে উঠে এসেছো ?

ফণি কোন উত্তর দিলে না।

ছোঁড়া বললে—আফিংয়ের নেশা!—বলে ঠাট্টা করবার জন্যেই একটা হাই তুলে তুড়ি দিলে।

ফণি ছোঁড়ার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বোধ হয়, ঘাড়টা ভেঙ্গে দিত সেই মুহূর্তেই, শেডে ঢুকল নতুন ম্যানেজার। সিংগী ছোঁড়াটা ম্যানেজারের সামনে দিয়েই গটগট ক'রে চলে গেল ;—মাথাও নোয়ালে না—শুধু হাত তুলে ছোট্ট সেলাম দিয়ে চলে গেল। ফণি মনে মনেই বললে—বড় বাড় হয়েছে তোমার। "অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে ভেঙে যাবে।"

নিজে উঠে সে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

ম্যানেজার বললে—তুমি না ফিটার ?

—আজ্ঞা হাঁ, আমি ফণি মিস্তিরী।

—ইঞ্জিন ড্রাইভার কোথায় ?

—ওই যে।

—তবে তুমি ইঞ্জিনে রয়েছ ? কিছু খারাপ হয়েছে নাকি ?

—না আজ্ঞা। উ আপনার তাজী ঘোড়ার মত ঠিক আছে।

—তবে ?

হেসে ফণি বললে—আমি আজ্ঞা সবই করি।

ম্যানেজার বললে—না। যার যা কাজ সে তাই করবে। তোমার কাছে বেশী কাজ কোম্পানী চায় না।

ফণি অনুভব করলে তার প্রতিপত্তি সম্মান সব চলে গিয়েছে, উবে গিয়েছে জাদুর ভাঁটার মত। আপিসে তার পরামর্শ নেবার জন্যে তাকে আর ডাকে না, কুলি-মজুর-বাবু কেউ তার কাছে আসে না, বলে না—মিস্ত্রী তুমি বাঁচাও! হৈ-চৈ স্বভাবের ফণি-মিস্ত্রী কেমন শান্ত মানুষ হয়ে গেল। তবে তার একটা সান্ত্বনা—প্রত্যহ গোটা কারখানাটার কোথাও না কোথাও তার ডাক পড়ে; সে না হলে কারখানাটা অচল। ম্যানেজার উদ্বিগ্ন, মুখে বলে—ফণি—এটাকে আজই সেরে না ফেলতে পারলে তো ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে!

ফণি সঙ্গে সঙ্গে জামাটা ছেড়ে ফেলে সবল বাহু দু'খানি বের ক'রে, যন্ত্র বাগিয়ে ধ'রে বসে যায়।—দেখছি আজ্ঞা!

ঠুক্-ঠাক্-ঠন্-ঠন্—হাতুড়ির ঘা মারে। দাঁতে দাঁতে টিপে দুই হাতে ঠেলে রেঞ্চ দিয়ে বোল্ট-নাট কষে। গা দিয়ে ঘাম ঝ'রে পড়ে। কখনও

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেশিনটার দিকে—ভাবে। কুলি-কামিন সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। মধ্যে মধ্যে সভয়ে, সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে—মিস্তিরী!

মিস্ত্রী হেসে আশ্বাস দিয়ে বলে—থাম-থাম—হচ্ছে—হচ্ছে।

ঘরে এসে ওই কথা ভাবে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। বোতল নিয়ে ব'সে গেলাসে ঢালে আর খায়। তার হাতে গড়া কারখানা, তাকে হঠায় কে?

এমন সময় এল যুদ্ধের বাজার। কারখানা হু-হু ক'রে বাড়তে লাগল। ফণি খাটতে লাগল দানবের মত। একটা শেডই সে বানিয়ে ফেললে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে! তিন চারগুণ মজুর, দিন রাত পরিশ্রম। প্রকাণ্ড উঁচু শালের খুঁটি পুঁতে মাথায় পুলি বেঁধে—সেখানে সন্ধ্যাবেলায় দড়ি টেনে উঠিয়ে দিত বড় বড় শক্তিশালী স্টোভ ল্যাম্প। নিজে সে চালের ফ্রেমে উঠে লোহার টি অ্যাঙ্গেলে ছাঁদা-ছাঁদি ক'রে বোল্ট-নাট কষত।

শেডের মধ্যে বসবে বিদ্যুৎশক্তির যন্ত্রপাতি। নতুন ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জি-নিয়ার সরু শিরার মত তারে তারে গোটা কারখানার দেওয়াল ছেয়ে দিলে। তারপর যন্ত্রগুলোর সঙ্গে বিচিত্র কৌশলে যোগ করলে। চালের মাথা থেকে তারের প্রান্তে ঝুলিয়ে দিলে সারি সারি আলো। পথের ধারে খুঁটি পুঁতে তাতেও ঝুলিয়ে দিলে আলো। তারপর একদিন সে টিপে দিলে ছোট্ট পেরেকের মাথার মত একটি যন্ত্রের মাথা। সমস্ত কারখানাটা দিনের মত আলো হয়ে গেল। শুধু শেডের ভিতরটাই নয়, কারখানার আশপাশের প্রান্তর, বাংলো, মেস, এমন কি ফণির কোয়ার্টার পর্যন্ত।

ফণি উল্লসিত উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল।

ইলেক্‌ট্রিক আলো সে দেখেছে, বিজলীর ভোজবাজীর কেরামতির কথা সে শুনেছে কিন্তু এমন ক'রে হাতে কলমে তাকে তৈরী করতে সে জানে না, কখনও দেখে নি। মনে মনে সে ওই তরুণ ইলেক্‌ট্রিক

ইঞ্জিনীয়ারের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে স্থির করলে। তরুণটির কৃতিত্বে চাতুর্যে প্রৌঢ় যন্ত্রশিল্পী মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ইঞ্জিনীয়ারটির পিঠ চাপড়ে বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা! জিতা রহো ভাই!

ইঞ্জিনীয়ার দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে—হোয়াট্'স্ দ্যাট্?

ফণি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।—না—না—না! আর কিছু সে বলতে পারলে না।

কিন্তু এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হ'ল না। ম্যানেজারের কাছ পর্যন্ত গড়াল। ম্যানেজার তাকে ডেকে বললে—মাফ চাইতে হবে তোমাকে।

—মাফ চাইতে হবে?

—নইলে তোমাকে আমি সাসপেণ্ড করব পনের দিনের জন্যে।

ফণি মাফ চাইতে পারলে না। কোনমতে সে বুঝতে পারলে না—সে কি অপরাধ করেছে। বললে—তাই করুন আজ্ঞা।

মনে মনে বললে—দেখা যাক। ফণিকে সাসপেণ্ড ক'রে কারখানা কেমন ক'রে চলে, দেখা যাক্। ইঞ্জিনে খুঁত দেখা দিয়েছে। রোজ ফণিকে এখন সেখানে হাতুড়ী ঠুকতে হয়—কোথায় কতটুকু লোহার টুক্‌রো প্যাকিং দিতে হয়, সে হিসেব ওই ছোকরার মাথায় আসবে না।

তিন দিনের দিন কারখানা বন্ধ হ'ল।

ফণি হাসলে মনে মনে। ওদিকে আবার কুলি মজুররা উস্‌খুস্ করছে। তাদের মাগ্‌গি ভাতা চাই। কম দামে তাদের চাল-ডাল-আটা-তেল-নিমক চাই। ফণি ঠিক করলে এবার সেও লাগবে। মাতবে। থাক্ কারখানা বন্ধ। তাকে ডাকলে সে যাবে না। কখনও যাবে না। অচল ইঞ্জিনটা তাকে না হ'লে চলবে না। সে জানে। জলুক শুধু আলোই জলুক। নিথর নিস্তব্ধ যন্ত্রপাতি পড়ে থাক জগদ্দল পাহাড়ের মত। সে জানে জাদু। সে যতক্ষণ না বল্‌বে ততক্ষণ পাহাড় চলবে না। কারখানা বন্ধ থাক; কুলিগুলো

চীৎকার করুক মজুরীর অভাবে, ম্যানেজার দিনরাত পরিশ্রম ক'রে নিরুপায় হয়ে যাক। সে নিজে আসুক। তারপর ফণি যাবে। সে ঠেকিয়ে দেবে তার জাদুদণ্ড! অমনি চলবে কারখানা। জগদ্দল পাহাড় ঘুরতে আরম্ভ করবে, চলতে আরম্ভ করবে, ইঞ্জিন চলবে, বেল্টিং পাক খাবে চাকায় চাকায়—শ্যাফ্‌ট ঘুরবে; মাটি বইবার বাল্‌তির সারি মাটি বোঝাই নিয়ে উপরে উঠবে—খালি হয়ে নামবে, গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরবে—

অকস্মাৎ শব্দ-ধ্বনিতে ফণি চকিত হয়ে উঠল। গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরছে! কারখানা চলছে! তাকে ছেড়েও কারখানা চলছে! তার হাতে গড়া কারখানা তার বিনা স্পর্শে চলছে! সে ছুটে বেরিয়ে এল। ঢুকল গিয়ে কারখানায়।

দেখলে কারখানা জনশূন্য। শুধু ইলেকট্রিক শেডে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ও ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। রহস্যটা এইবার সে বুঝতে পারলে। শুনেছিল —ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ারে কারখানা চলবে। আজ চলছে।

সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর তাকে দরকার নাই। তারই হাতে গড়া কারখানা চলছে—অথচ তার হুকুম নেয় নি। কোন দিন আর নেবে না। কেউ আর তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না। আপিসে তাকে আর ডাকে না, 'মিস্ত্রী বাঁচাও' বলে কুলীরা আর তার কাছে আসে না, সিংগী প্রভৃতি ছোঁড়ার দল তাকে দেখে হাই তুলে ঠাট্টা করে; আর এই কারখানা —তার নিজের হাতে গড়া কারখানা—সেও তার বিনা হুকুমে চলছে; আর কোনদিন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না।...শব্দধ্বনি-মুখর শেডে ঘূর্ণমান যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সে চলে যাবে। আর সে এখানে থাকবে না। কারখানাটাও আর তাকে চায় না। সে চলে যাবে।

যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পথ। তার অত্যন্ত পরিচিত পথ। বিহ্বল মিস্ত্রীর চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। হঠাৎ তাকে পিছন থেকে

টানলে। মিস্ত্রী হাসলে,—সেই ফুলু ছোঁড়া। যেতে দেবে না!—না! —না—না—ছাড়! ছাড়! ছাড়…

বৈদ্যুতিক শক্তি-সংযোগে কারখানাটা চলার পরীক্ষা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে স্মিতমুখে ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারকে বললে—দ্যাট্'স্ অল্‌রাইট।

হঠাৎ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ও-দিকটায়—যেখানে স্থূল আকারের বড় বড় কয়েকটা চাকা তীক্ষ্ণ দাঁতে দাঁতে মিলে ঘুরছে—সেখানকার শ্যাফ্‌ট্‌টা ঝাঁকি খেয়ে বার-দুয়েক কেঁপে উঠল। কিন্তু সে ঝাঁকি বিরাট যন্ত্রদেহের মধ্যে বুঝবার মত স্পষ্ট নয়।

অধীরতায় অসাবধান ফণি চাকার দাঁতে ধরা পড়েছে; কারখানা তাকে ছেড়ে দেয় নি। সে তাকে গ্রাস ক'রে নিয়েছে—তার দাঁতের দু'পাশ বেয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো—পাশে মেঝের উপর পড়েছে হাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রো; কিন্তু প্রচুর ফায়ারক্লের ধুলোর মধ্যে সে-ও মিশে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন করেই যেন যন্ত্রদানব ফণিকে আত্মসাৎ করছে।

মেশিন চলছে। রক্ত শুকিয়ে গেল—চাকায় থেকে চাকায় ঘুরে ঘুরে মাংস-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল; ফণির চর্বিতে শুধু যন্ত্রপুরীর এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মসৃণ স্বচ্ছন্দগামী ক'রে দিলে। মেশিন চল্‌ছে স্বচ্ছন্দে, শব্দের মধ্যে কান পেতে শুন্‌লে বোধ হয় ফণির মোটা গলার গান শোনা যাচ্ছে।

ম্যাঁনেজার বিদ্যুৎশক্তিতে যন্ত্রের সাবলীল গতিতে চলার ধারা দেখে বল্‌লেন—সুইচ্ অফ প্লিজ্!

রাঠৌর ও চন্দাবত

লোকে আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল যে, পুন্নাগ্রামের রাজপুতদের সহিত কামতপুরের রাজপুতদের বিবাদের অবসান হইয়া গেল! দীর্ঘ দিনের বিবাদ—পাঁচ-সাতপুরুষ ধরিয়া, কি তাহারও অধিক কাল ধরিয়া এ বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। কবে কোন্ অতীত কালে, পাঠান অথবা মোগল আমলে, দুইটি ভাগ্যান্বেষী রাজপুত পরিবার বাংলার এই অখ্যাত অজ্ঞাত পাশাপাশি দুইটি পল্লীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস কেহ জানে না, কিন্তু তাহাদের রক্তাক্ত বিবাদের কথা কাহারও অজ্ঞাত নয়, কারণ এই সেদিন পর্যন্তও সে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। লোকে ভুলিবার অবসর পায় নাই।

কামতপুরের রাজপুতেরা রায়, পুন্নার রাজপুতেরা সিংহ। রায়েরা বলে, আমরা হলাম রাঠোরা রাজপুত। ও বেটারা চাঁদাই; আমরা হলাম উঁচু।

সিংহেরা বলে, চাঁদাইয়ের সমান এক আছে চানাইরা। রাঠোরা রাজপুত আবার রাজপুত নাকি? বামুনদের যেমন ছত্রিরি, ওরা হ'ল তাই।

বংশ-মর্যাদা লইয়া বিরোধের মীমাংসা মুখের কথায় হওয়া দূরের কথা, বংশদণ্ড দিয়াও সম্ভবপর হয় নাই। উভয় পরিবারে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দল বাড়িয়াছে, বল বাড়িয়াছে, বিরোধের হেতুও বাড়িয়াছে। পাশাপাশি গ্রাম, মধ্যে একখানি মাঠ মাত্র ব্যবধান, ওই মাঠেই দুই পক্ষের চাষের জমি, কাজেই সীমানা লইয়া দাঙ্গা, চাষের জল লইয়া মাথা ফাটাফাটি, এমন কি কোন পক্ষের কাহাকেও একা পাইলে অপর

পক্ষের দুই চারিজন জুটিয়া বেশ করিয়া ঠেঙাইয়া দিত। গ্রীষ্মের সময় বিপদ হইত সর্বাপেক্ষা অধিক। উভয় গ্রামেরই অন্যান্য অধিবাসীরা ভয়ে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। নিয়ত এই রাজপুত বংশের ধ্বংস কামনা করিত। রাত্রে কখন যে রাজপুত পাড়ায় আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার কোন ঠিক নাই, তবে জ্বলিয়া উঠিবে এটা ঠিক। এমনিই করিয়া আজ পাঁচ-সাতপুরুষ উভয় পক্ষের মধ্যে হিংস্র বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

কামতপুরের ভৈরব রায়—রায় বংশের মধ্যে প্রবীণ এবং প্রধান, অবস্থাও বেশ ভালো, মোটা চাষী এবং উদ্যোগী পুরুষ; এমন জিনিস নাই, যাহা রায়জীর ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না; ভৈরব রায় কামতপুরের রাজপুতদের মধ্যে বেশ একটা প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। তাহারা জমিদার বাড়ীর বরকন্দাজ পদের মোহ ছাড়িয়া চাষে মন দিয়াছে। পুন্যার সিংহদের অবস্থা ভালো হইলেও তাহাদের এমন একটি শ্রী-শৃঙ্খলা নাই। তাহাদের অধিকাংশই এখনও মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লাঠি হাতে জমিদার সেরেস্তার সর্দারি করিয়াই ফেরে। সিংহদের সর্দার স্বরূপ সিংহ প্রত্যক্ষ বাঁধা-ধরা চাকরি করে না বটে, কিন্তু দুই ক্রোশ দূরবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রামখানার জমিদার বাড়ীর নিয়মিত তন্‌খা বাড়ীতে বসিয়া ভোগ করিয়া থাকে। ডাক পড়িলেই যাইতে হয়। তাহার বড়ছেলে অর্জুন ওই বাবুদের বাড়ীর দাঙ্গাতে জখম হইয়া মরিয়াছে, অর্জুনের ছেলেটা অতি শিশু বয়স হইতে বাবুদের বাড়ীতেই পোষ্য হিসাবে মানুষ হইতেছে। কিন্তু সে সব স্বরূপ সিংহের গৌরবের বস্তু—রাজপুতের ছেলে দাঙ্গায় মরিবে না তো মরিবে কি রোগে ভুগিয়া! সিংহের পাকানো গোঁফ, গালপাট্টায় ভাগ করা চাপদাড়ি, মাথায় বাবরি চুল, সবই প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, চেহারাও বেশ জমকালো, লম্বা চওড়া, এখনও জোয়ানের মত সোজা, শক্ত। দীর্ঘ পাঁচ-সাতপুরুষ পরেও স্বরূপ সিংহকে বাংলার মাটিতে

বিদেশী বলিয়া ভ্রম হয়। বুড়া সকালে উঠিয়াই চুল দাড়ি আঁচড়াইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া বাহিরের দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর একটা ময়লা তাকিয়ায় হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানে, আর পুন্থার রায়দের গাঁলিগালাজ করে, কাজের মধ্যে বড় জোর ঢেঁরা ঘুরাইয়া শণের দড়ি পাকায়।

সেদিন সিং বলিয়াছে, ভৈরব রায়কে বলিস্ পরতাপ রায়ের তলোয়ার খানা টুটাইয়ে লাঙ্গলের ফালের মুখে যেন লাগাইয়ে দেয়, চাষের মাটি হোবে খুব ভালো। এখনও পর্যন্ত তাহাদের ভাষার উচ্চারণে একটা বিদেশী সুরের রেশ ধ্বনিত হয়। বেশ লাগে সেটা। প্রতাপ রায়—রায় বংশের প্রথম পুরুষ। কামতপুরের রায়-রাজপুত বংশের যুবক সম্প্রদায় কথাটা শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, কিন্তু সর্দার ভৈরব রায় অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির লোক, একটু হিসাবী মানুষ; সে সকলকে শান্ত করিয়া হাসিয়া বলিল, রামদেও সিংহীর বরছাখানা নিয়ে স্বরূপ সিংহীকে পাঠাইয়ে দিস—আমাদের চাষের ক্ষেতে বহুত খরগোসের আমদানী হইয়েছে, আমাদের ক্ষেতে পাহারা দিবে, খরগোস মারবে, জিমিদার যা তন্‌খা দেয়, তার দুনা তলব দিব আমরা।

এমন উত্তরটা শুনিয়া রায়-রাজপুত যুবকেরা খুশি হইয়া গেল, তাহারা শান্ত হইয়া তখনকার মত দাঙ্গা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিল।

ভৈরব রায় গায়ে লম্বা পাঞ্জাবী পরিয়া, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—আমি রামপুর যাচ্ছি, বোর্ডিঙে চালের দাম আনতে। এর মধ্যে কেউ যেন কুচ করিয়ে বসবি না।

একটি পনেরো ষোল বৎসরের ছেলে বলিয়া উঠিল, বাঃ, ওরা যদি গাঁ চড়াও করিয়া দাঙ্গা করিতে আসে?

ভৈরব হাসিয়া বলিল,—বলবি, আমাদের হাত জোড়া আছে, এখন ফিরিয়ে এস। আবার বলিল, এই দেখ, ইচড়ে পাকলে অকালে খ'সে

পড়ে, বুঝলি, পাকামো বেশি ভালো নয়। পাকড়ি বাঁধা শেষ করিয়া রায় গোঁফ জোড়াটায় চাড়া লাগাইয়া আয়নায় একবার মুখ দেখিয়া লইয়া তারপর পিতলের তার দিয়া নক্সা কাটা বাঁশের লাঠি গাছাটা হাতে বাহির হইল।

সমবেত যুবকের দল প্রশংসমান দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া ছিল, একজন বলিল, চেহারা আমাদের সর্দারের! বলিহারির চেহারা! অপর একজন বলিল, আর স্বরূপো বেটা চেপ্‌সা, যেন একটা কোলা ব্যাঙ্‌!—বলিয়া সে গাল ফুলাইয়া এমন একটা ভঙ্গি করিল যে, মজলিস্‌ সুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াইয়া পরিল। ভৈরব রায়ের চেহারা সত্যই ভাল। বাবরি চুল, গালপাট্টার জমক না থাকিলেও ভৈরবের আকৃতির মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। মেদবাহুল্য-বর্জিত লম্বা খাড়া সোজা মানুষ, নির্ভীক দৃষ্টি, বড় বড় চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, টকটকে রং। ভৈরবকে দেখিয়া একটা সম্ভ্রম জাগে। স্বরূপ সিংহকে দেখিয়া ভয় হয়।

দীর্ঘ পদক্ষেপে ভৈরব চলিয়া গেল। সে গমন-ভঙ্গির মধ্যে বেশ একটি ধীর-বিক্রম সুপরিস্ফুট।

দুই ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, এই গ্রামের স্কুল বোর্ডিংয়ে কিছুদিন পূর্বে রায় চাল সরবরাহ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরকারি, কলাই —ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া টাকা অনেক বাকি পড়িয়াছে, কাজেই এবার রায়কে স্বয়ং আসিতে হইল। হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণ বাবু প্রাচীন মানুষ। তিনি বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। রায় গিয়া প্রাচীন প্রথামত একটা সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রতি-নমস্কার করিয়া চন্দ্রভূষণবাবু বলিলেন, আসুন, রায়জী আসুন।

রায় বলিল, আজ্ঞা হাঁ, একবার মেহেরবানি করতে হবে মাষ্টারজী! এই সময় আবার খইল, নুন কিনতে হোবে। চাষী লোক আমরা!

—তা বেশ তো, যান আপনি বেহারী পণ্ডিতের কাছে।

বেহারী পণ্ডিত বোর্ডিংয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তহবিল রাখিয়া থাকেন। রায় বলিল, হুজুর ব'লে না দিলে দিবেন না পণ্ডিতজী; পণ্ডিতজীর হাতটা বড় কষা। পণ্ডিতজীর বাক্সেতে বোধ হয় টাকার বাচ্চা হয়।

হাসিয়া চন্দ্রভূষণবাবু বলিলেন,—আচ্ছা চলুন, আমি ব'লে দিচ্ছি।

তিনি উঠিলেন। অপরাহ্ণ বেলায় বোর্ডিং-প্রাঙ্গণে ছেলেদের খেলার সমারোহ লাগিয়া গেছে। প্যারালেল বার, হরাইজণ্টাল বারে কয়জন কিশোর ব্যায়াম করিতেছিল; একপাশে হাডু-ডুডু খেলা চলিতেছে। অকারণে কলরব করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে ছোট ছেলের দল। রায় দেখিয়া একবার না দাঁড়াইয়া পারিল না। সে বলিল, বাহা, বাহা, আচ্ছা ঘুরছে ছোকরা! বহুত আচ্ছা!

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের সময়ে ছিল এ সব?

রায় বলিল, তা বটে। আমাদের ছিল লাঠি, তলোয়ার, সড়কি, ঢাল আর কুস্তি।

মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া ছেলেদের ব্যায়াম সমারোহ যেন মন্থর হইয়া পড়িল। রায় বলিল, চলোন, চলোন মাষ্টারজী, বাচ্চারা সব আপনাকে দেখে ভয় করছে।

টাকাকড়ি লইয়া রায় আসিবার সময় বলিল, ওই সব কসরতের ওই যে ফেরেম, ওগুলির মাপ আমাকে দিতে হবে মাষ্টারজী। গাঁয়ে ছেলেদের লেগে আখড়াতে বানিয়ে দেব।

মাষ্টার বলিলেন, তা বেশ তো।

তারপরই রহস্যচ্ছলে বলিলেন, আপনিও দেখবেন একটু আধটু চেষ্টা ক'রে। রায় গম্ভীরভাবেই বলিল, হ্যাঁ তা এখনও পারি।

সপ্রশংস স্বরে মাষ্টার প্রশ্ন করিলেন, কত বয়স হ'ল আপনার?

তা ষাট হবে বই কি হুজুর।

ষাট? কিন্তু শরীর তো আপনার চল্লিশের মত শক্ত! আচ্ছা, ক' পুরুষ আপনারা এখানে এসেছেন?

সাত পুরুষ আমাকে ধ'রে!

কোন্ দেশে আপনাদের ঘর ছিল? রায় মাথা নাড়িয়া বলিল, উ আমার জানা নেই মাষ্টারজী। তবে আমরা হলেম রাঠোরা রাজপুত।

ও, রাঠোর! তা হ'লে আপনাদের দেশ ছিল মাড়বার। রাঠোর খুব বড় রাজপুত। মহা মহা বীর, বড় বড় রাজা রাঠোরদের মধ্যে হয়েছে। আপনারা তো রায় নন—রাও, এদেশে রায় বলে।

হ্যাঁ? কেয়াবাৎ মাষ্টারজী উঃ বিদ্যাকে কি গুণ দেখেন! বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রায়জী বিদ্যার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল, তারপর সে প্রশ্ন করিল, তা হ'লে চাঁদাই রাজপুতটা আসলে কি বলেন তো মাষ্টারজী, ওরা কেমন রাজপুত?

চাঁদাই? মাষ্টার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বোধ হয়—কিন্তু সে তো বলে শিশোদীয়া—দাঁড়ান, ওরে মোহনকে ডেকে দেতো।

একটি সতেরো আঠারো বছরের ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল! রায় চিনিল, এই ছেলেটিই বারে বারে ঘুরপাক খাইতেছিল। মাষ্টার বলিলেন, আপনাদের রাজপুতেরই ছেলে এটি। ও, আপনি তো চেনেন। আপনাদের ওখানকারই তো!

সবিস্ময়ে রায় বলিল, আমাদের ওখানকার? কার ছেলে?

মোহন বলিল, আমি স্বরূপ সিংহের নাতি। আমার বাবার নাম ছিল—অর্জুন সিংহ।

ওহো! হ্যাঁ, হ্যাঁ! তা তুমি বাবুদের ঘরে কাজ কর না? দাঙ্গায় তোমার বাবা খুন হবার পর থেকে তুমি তো বাবুদের ওখানে কাজ শিখছ?

না আমি পড়ি।

পড় !—ভৈরব রায়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। মাষ্টার বলিলেন, হ্যাঁ, বাবুরাই ওর পড়ার সমস্ত খরচ দেন। ওর বুদ্ধি দেখে খুশি হয়ে বাবুরা স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। আচ্ছা, চাঁদাই রাজপুত—কোন্ রাজপুত? মোহন, তুই তো এ সব ইতিহাস খুঁজছিলি।

মোহন বলিল, চন্দাবত। আমরা নিজেরাই চাঁদাই রাজপুত।

মাষ্টার বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দাবত। এও খুব বড় বংশ।

মোহনের দিকে চাহিয়াই রায় প্রশ্ন করিল, কিন্তু বড় কোন্‌টা ?

মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন, দুই সমান, রাঠোরেরা বলে, আমরা রামচন্দ্রের বংশ; আর চন্দাবত বলে, আমরা পাণ্ডব বংশ। ওর আর কি বড় ছোট আছে!

হ্যাঁ? আমরা হলাম রামচন্দ্রের বংশ? আর চাঁদাই হ'ল পাণ্ডব বংশ? তারপর মোহনকে বলিল, বাহা বাহা ভাইজী, তুমি অর্জুনের ছেলে!. তা হোবে, বাপের মত জোয়ান হোবে তুমি। বাঃ, বেশ ছাতি! তুমি পুন্না যাও না ভাই?

বেশি যাই না, এইখানেই থাকি। ছুটিতে কখনও মামার বাড়ী যাই, কখনও পুন্না যাই।

আমাকে চিনছো তুমি? আমি হলাম ভৈরব রায়। কামতপুর আমার বাড়ি।

মোহন তাড়াতাড়ি তাহাকে প্রণাম করিল। রায় মাস্টারকে সেলাম করিয়া বলিল, আসি হুজুর। ভাইকে একটু এই এক কদম লিয়ে যাই হুজুর।

মাস্টার বলিলেন, তা যাক না একটু।

কিছুদূর আসিয়া রায় মোহনের হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল, মিঠাই

খাইও ভাইজী।

মোহন বিব্রত হইয়া কহিল, না না, টাকা আমি নোব না।

না না, আমি খুশি হয়ে দিলাম ভাইজী। না নিলে আমার বড় দুখ হোবে দাদু।

মোহন টাকাটা লইয়া বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দিন-দুই পরেই স্বরূপ সিংহ রণবেশে আসিয়া হাজির হইল, সঙ্গে দশ বারো জন জোয়ান ছেলে। ভৈরব রায় মহা সমাদর করিয়া বলিল, আরে আরে, এস এস, সিংহী এস, ভাইজী এস।

স্বরূপ সিংহ উগ্রস্বরে বলিল, আমার নাতিকে তুমি টাকা দিয়েছ? আমার টাকা নাই?

ভৈরব বলিল, আরে ভাইজী, ব'স, আগে ব'স।

তুমি আমার নাতিকে বখশিস্ করেছ এক টাকা?—ক্রোধে যেন স্বরূপ সিংহ ফাটিয়া পড়িতেছিল, ওদিকে রায়-রাজপুতেরাও দলে দলে আসিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, তোমার নাতি আমার কি কেউ নয় ভাইজী?

তারপর বাড়ীর ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া হাঁকিল,—রতন, জল নিয়ে আয় পা ধোবার, জলদি। স্বরূপ ভৈরবের এমন ধারার উত্তরে বিব্রত হইয়া ঝগড়ার একটা পথ খুঁজিতেছিল। সে বলিল, না, সে আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার অপমান করেছ। ভৈরব বলিল, তোমার অপমান আমি করতে পারি ভাই, না, আমার অপমান তুমি করতে পার? দে দে, পা তুই নিজে ধুইয়ে দে।

ভৈরবের পৌত্রী রতন জলের ঘটি হাতে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভৈরব তাহাকে পা ধুইয়া দিতে আদেশ করিল। রতন স্বরূপ সিংহকে বলিল, বসেন আপনি। দশ বারো বছরের ফুট্‌ফুটে সুন্দর মেয়েটির কথা স্বরূপ

এবার ঠেলিতে পারিল না, সে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিল, ভৈরব রায়বংশের ছেলেদের হুকুম করিল, নিয়ে আয়, শতরঞ্চি মাদুর নিয়ে আয়, সিংহদের বসতে দে সব।

স্বরূপ বলিল, তোমাকে টাকা কিন্তু ফিরে নিতে হবে রায় ভাই।

বেশ তো, আমি তোমার নাতিকে দিয়েছি; তুমি আমার নাতনীকে দিয়ে যাও। স্বরূপ খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, বাহা বাহা! রায়ভাইয়ের মাথা আমার বড় সাফা! ঠিক বলেছ তুমি।

ভৈরব বলিল, আরে ভাই আমাদের মোহন ভাইয়ার মাথা যা দেখলাম আঃ, কি বলব ভাইজী। মাস্টারজীর মনে পড়ল না, মোহন টপ্ টপ্ ব'লে দিলে রে ভাই!

স্বরূপ পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, হাঁ?

ভৈরব বলিল, বললো কি জান, রাঠোরা হ'ল রাঠোর রাজপুত, আর চাঁদোয়া হ'লো চন্দাবত। রামচন্দ্রের বংশ আর পাণ্ডবদের বংশ। সমস্ত রাজপুতেরা নির্বাক বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল। রামচন্দ্র! পাণ্ডব! পা ধোয়াইয়া দিয়া রতন চলিয়া যাইতেছিল। ভৈরব বলিল, দিদিরা আমার কুচ কামকে না? গড় কর, আশিস্ লে বহিন।

রতন লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া স্বরূপ সিংহকে প্রণাম করিল, স্বরূপ তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, বাহারে বাহারে। বহিন যে আমার একদম পরীর মত খুবসুরতি। আ হায় হায়!

ভৈরব বলিল, আশিস্ কর ভাই। দাও, টাকা দাও, এক টাকা তো না লেবে বহিন।

স্বরূপ দুইটা টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল, জরুর। চাঁদি দেনেকো হাত তো নেহি, ইয়ে তো সোনে দোনকো হাত। লেকেন হাম গরীব।

ভৈরব সে কথার উত্তর দিল না, সে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

সব লোক সাক্ষী, স্বরূপ সিং আমার নাতনীকে আশিস্ করলেন, আমি আশিস্ করেছি সিংজীর নাতি মোহনকে। তা হ'লে দু'জনের বিয়ে পাকা হয়ে গেল।

সমস্ত জনতাই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল, স্বরূপ সিংহও প্রথমটা বেশ অনুধাবন করিতে পারিল না, সেও সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল, ভৈরব আবার বলিল, আমি সাক্ষী রেখে কথা দিলাম, পাঁচশো টাকা নগদ যৌতুক দেব আমি।

স্বরূপ সিংহ এবার হাসিয়া বলিল, তুম চোট্টা হ্যায়।

ভৈরব ঠিক তেমনই উত্তর দিল, তুম ডাকু হ্যায়।

তারপর আসিল জল খাবার, তারপর মদ।

বিবাহের আয়োজন খুব সমারোহের সহিতই হইয়াছিল, ভৈরব রায় আয়োজন করিয়াছে প্রচুর, চাঁদোয়া খাটাইয়া, মণ্ডপ বাঁধিয়া আলোয় বাজনায় এ অঞ্চলের একটা বিস্ময়কর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাজপুতদের সকলে গোঁফে চাড়া দিয়া পাগড়ী পাঞ্জাবী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হাতে লাঠি। ভৈরবের কোমরে ঝুলিতেছে প্রতাপ রায়ের তরবারি। দুই জালা মদ গোপনে চোলাই করা হইয়াছে। সিংহদের চোলাই হইয়াছে চার জালা। মদের নেশার বেশ একটা আমেজ লাগিয়া গিয়াছে।

বর আসছে, বর আসছে।

একদল কলরব করিয়া ছুটিয়া আসিল, বর আসছে। এই মাঠে আসছে। দুই গ্রামের মধ্যের মাঠে প্রায় শতখানেক মশাল জ্বালাইয়া বরযাত্রী আসিতেছিল, ঘোড়ার উপর বর চলিয়াছে। তাহার অঙ্গে রাজ-বেশ, মাথায় রেশমী পাগড়ী, কোমরে তরবারি। ঘোড়ার পাশেই পাল্কিতে

স্বরূপ সিংহ নিজে। গ্রামের প্রবেশ মুখে স্বরূপ পাল্কি হইতে নামিয়া ঘোড়ার আগে আগে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার নেশার আমেজ মাথা চোখের সম্মুখে এক-শো মশাল যেন হাজার হাজার হইয়া উঠিয়াছে। কন্যার দুয়ারের সম্মুখেই ভৈরব লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল! প্রথমেই প্রথামত উভয় কর্তা লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধের অভিনয় করিয়া লাঠি ফেলিয়া আলিঙ্গন করিবে। স্বরূপ আসিয়া দাঁড়াইতেই ভৈরব হাসিল। স্বরূপ কৌতুক-ভরে অপ্রস্তুত ভৈরবের শিথিল মুষ্টিতে ধরা লাঠিগাছটার উপর প্রচণ্ড একটা লাঠির আঘাত করিল, ভৈরবের হাতের লাঠি খসিয়া পড়িয়া গেল। সিংহ-রাজপুতেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভৈরব অপমানিত বোধ করিলেও সে অপমান সহ্য করিয়া লাঠিগাছটা কুড়াইয়া লইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিপর্যয় বাধিয়া গিয়াছে, রায়-রাজপুতদের একগাছা লাঠি সাঁ করিয়া স্বরূপের মাথার উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপের পাগড়ীটা ছিটকাইয়া লুটাইয়া পড়িল পথের ধূলায়। রায়-রাজপুতদের সে কি তীক্ষ্ণ হাসি। পরমুহূর্তেই স্বরূপের তরবারিটা আসিয়া পড়িল ভৈরবের কাঁধে, ভৈরব আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। তারপর সত্য সত্যই বাংলার পল্লীর মধ্যে রাজপুতানার ঐতিহাসিক একরাত্রির পুনরভিনয় হইয়া গেল। আর্তনাদে, উন্মত্ত চীৎকারে রাত্রির অন্ধকার ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

স্বরূপ মোহনকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া বলিল, নিয়ে আয়, ঘর থেকে টেনে নিয়ে আয়। মোহনের শরীরের মধ্যে একটা পরম উত্তেজনা অগ্নি-শিখার মত হু হু করিতেছিল। কানের পাশ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। রাজপুতানার ইতিহাস সে যেন চোখে দেখিতেছে—সংযুক্তার স্বয়ম্বর! সে লাফ্ দিয়া পড়িয়া অন্দরের দিকে ছুটিল। খাপ হইতে তলোয়ারখানা খুলিয়া বাহির করিয়া লইল।

বর—বর। মেয়েরা বরকে ধরিবার জন্য ছুটিল; মোহন আলোক লক্ষ্য করিয়া ঘরে ঢুকিয়া রতনের হাত ধরিয়া টানিল। রতন প্রাণপণে খাটের বাজু আঁকড়াইয়া ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা ঝট্‌কা মারিয়া মোহন রতনের হাত ছাড়াইয়া লইল। তারপর দ্রুতবেগে তাহাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া চলিল। কিন্তু পথ আটক করিল একজন তাহারই সমবয়সী কিশোর, তাহার হাতে লাঠি, মোহনের হাতে তরবারি। আঘাতের প্রতিঘাতে মোহনের দেহে লাঠির আঘাত লাগিল, কিন্তু প্রতিপক্ষ তরবারির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

স্বরূপ সিংহ মুহূর্তে পাল্কির মধ্যে কন্যাকে আবদ্ধ করিয়া বেহারার কাঁধে পাল্কি তুলিয়া দিল। মোহন ঘোড়ায় ছুটিল। স্বরূপ পিছনে পশ্চাৎ দেশ রক্ষা করিতে করিতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। সিংহদেরও একজন খুন হইয়া গেল। আহত হইল অল্প-বিস্তর সকলেই। কিন্তু তবু তাহার জন্য আক্ষেপ নাই, একটা উন্মত্ত উল্লাসে সিংহেরা অবশিষ্ট রাত্রিই হো হো করিয়া কাটাইয়া দিল।

মন যে যুগেরই হউক কিন্তু দিন বর্তমান যুগের। রাত্রির অন্ধকারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে সত্য প্রকট হইয়া দেখা দিল। প্রভাতেই পুলিস আসিয়া উভয় পক্ষকেই দাঙ্গা করার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দুইখানা গ্রামের রাজপুত পল্লীর মধ্যে পড়িয়া থাকিল শুধু নারী ও শিশু। গ্রেপ্তারের পূর্বেই স্বরূপ মোহনকে বলিল, দে, বউয়ের সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে দে।

মামলা শেষ হইল ছয় মাস পর। দুই পক্ষেরই পাঁচ বৎসর, সাত বৎসর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল। স্বরূপ সিংহের শুধু ফাঁসির হুকুম হইল। মোহনেরও ফাঁসি হইত; কিন্তু স্বরূপ বলিয়াছিল, মোহন আক্রমণ করিলেও স্বরূপই গিয়া মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়াছে

ভৈরবের হত্যাও সে গোপন করে নাই। বিচারক সমস্ত বুঝিয়াও মোহনকে ফাঁসি হইতে অব্যাহতি দিয়া সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। একেবারে অব্যাহতি পাইল কয়েক জন।

বলিতে ভুলিয়াছি, সেই রাত্রির পর প্রভাতেই পুলিস আসিয়া সকলকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে রতনকে তাহারাই বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পর একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেশব চাটুজ্জে স্বরূপ সিংহের স্ত্রী বৃদ্ধা সিংহ-গিন্নীর দূত হইয়া রায়দের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই মোহন খালাস হইয়া আসিবে, তাই রতনকে পাঠাইয়া দিতে হইবে। রতনের বড় ভাই ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া বলিল, আপনি বেরাহ্মণ, অন্য কেউ হ'লে তাকে খুন করতাম আমি। এই সেদিন জেল থেকে ফিরেছি আমি, এখনও আমার সাধ মেটে নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যের মর্য্যাদায় সাহস পাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, বাবা, মাথাটা একটু শেতল ক'রে কথা বল। দেখ, রতন মেয়েছেলে, তার রক্ষক চাই।

বাধা দিয়া রতনের ভাই বলিল, জানেন ঠাকুর মশাই, রাজপুতের ঘরে আমরা নুন দিয়ে কন্যে-সন্তান মারতাম ?

বৃদ্ধ আর সাহস করিল না, ফিরিয়া আসিল। মোহন ফিরিলে সিংহ-গিন্নী বলিল, দূর গাঁয়ে একটি বেশ বড়-সড় মেয়ে আছে। কাকে পাঠাব বল দেখি দেখতে ? কার পছন্দতে তোর পছন্দ বল দেখি ?

মোহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধা বলিল, ওরা ত পাঠাবে না মেয়ে।—বলিয়া সে সমস্তই মোহনকে জ্ঞাপন করিল। রাত্রির অন্ধকারে মশালের আলোকের আভাসে রক্তে যে আগুন তাহার একদিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ডতা আছে যে, সে অত্যা-

চারে দমিত হয় না, শাস্তির কঠোরতায় অনুশোচনার চোখের জলে ধুইয়া-
যায় না, সে যাইবার নয়। সেই আগুন আবার রক্তের মধ্যে নাচিয়া উঠিল,
গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সহসা মোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তাহার হাত
ধরিয়া বলিল, না, সে আর হবে না মোহন, তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে
মরব।

অবশেষে স্থির হইল, একজন চতুরা দূতী পাঠানো হউক, রতন কি
বলে সেটা শোনা প্রয়োজন। দূতী ফিরিয়া আসিয়া শুনাইল সেই একই
কথা। রতন মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছে, মরণ! গলায় একগাছা দড়ি দিতে
বল্‌গে।

মোহন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। মেয়েটা আবার বলিল, ভাই-ভাজ তো
খেতে দেয় না। রতন ঘুঁটে দিয়ে ধান ভেনে খায়। তা আমি বললাম, এ
কষ্ট তোমার কেনে? তা আমাকে বললে, আমার ঘরে পাঠিয়ে দিস,
আমার গোবর কুড়িয়ে দিলে আমি খেতে দোব।

মোহন লাফ দিয়া উঠিল। সে কিছুতেই নিরস্ত হইল না, রায়দের
সংবাদ পাঠাইয়া দিল, আগামী পরশু সে রতনকে আনিতে যাইবে। সব
যেন উদ্যোগ করিয়া রাখে। সিংহপাড়ার নূতন ছেলের দল পূর্বপুরুষদের
লাঠি-সড়কি ঝাড়িয়া মাজিয়া ঠিক করিতে বসিল। নির্দিষ্ট দিনে পাল্কি
বেহারা ও সহচরদের সঙ্গে লইয়া মোহন রায়দের বাড়ীতে আসিয়া হাজি
হইল। সহচরদের সাবধান করিয়া দিয়াছিল, যেন প্রথমেই আক্রমণ
করে। আশ্চর্য, রায়দের কোন উদ্যোগ নাই। তাহারা চুপচাপ সব শু
হাতে বসিয়া আছে। মোহন বলিল, আমার পরিবারকে পাঠিয়ে দাও।

রতনের ভাই বলিল, বিয়েই তো হয় নাই, তার আবার তোমার পরিব
কি ক'রে হ'ল?

মোহন চীৎকার করিয়া বলিল, আলবৎ হয়েছে।

বেশ, হয়েছে তো তোমার পরিবারকে তুমি নিয়ে যাও।

মোহন আর অপেক্ষা করিল না, সে হনহন করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, রতন!

কে কোথায়! সে আবার ডাকিল, রতন!

অকস্মাৎ জুতার কঠিন শব্দে চমকিয়া উঠিয়া মোহন পিছন ফিরিয়া দেখিল, জন-দুই কনস্টেবল ও একজন পুলিস-কর্মচারী। মোহন চমকিয়া উঠিল। মুহূর্তে রায়-রাজপুতদের নিরস্ত্র নীরবতার কারণ বুঝিয়া লইল। কর্মচারীটি বলিলেন, হাতকড়ি লাগাও। মোহন সাহস করিয়া বলিল, কেন?

মেয়ে চুরি করতে এসেছে, বেটা শয়তান, খুনে ডাকাত!

চুরি! আমার পরিবারকে আমি নিতে এসেছি।

পরিবার? কে তোর পরিবার? ডাক, বেরিয়ে আসুক সে।

মোহন ডাকিল, রতন।

কেহ কোন সাড়া দিল না, কর্মচারীটি এবার বলিলেন, বাঁধ বেটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবল দুইজন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ওকে ধরছেন কেন? আমার স্বামী আমাকে নিতে এসেছেন, আমি যাবো।—অবগুণ্ঠনাবৃতা রতন উঠানে আসিয়া বলিল, ছেড়ে দেন ওঁকে।

রতনের ভাই চীৎকার করিয়া উঠিল, জন্মের মত বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

পরমানন্দেই মোহন পাল্কির সঙ্গে চলিয়াছিল। পাল্কির মধ্যে রতন; মোহন অবিশ্রাম বকিয়াছে, কিন্তু রতন নির্বাক। অকস্মাৎ সে বলিল, পাল্কি নামাতে বল।

পাল্কি হইতে নামিয়া রতন বলিল, আমি যাব না।

যাব না!—মোহন সবিস্ময়ে প্রশ্নের ভঙ্গিতে রতনের কথা কয়টির প্রতিধ্বনিই করিল মাত্র। আর কোন কথা তাহার মনে আসিল না।

রতন বলিল, না। আমার দাদুর কথা, ভাইয়ের কথা আমিও ভুলতে পারব না, তোমার দাদুর কথা তুমিও ভুলতে পারবে না। আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি আবার বিয়ে করগে।

মোহন তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না!

না নয়, ছাড়। তোমার আমার ঘর করা হয় না।

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা অমোঘ নির্দেশের প্রতিধ্বনি ছিল, যে ধ্বনির সুরে দুর্দান্ত রাজপুতের হাত দুইটি শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িল।

সে আর্তস্বরে বলিল, কিন্তু কোথায় যাবে? তোমার দাদা—

বাধা দিয়া রতন বলিল, এত বড় পৃথিবীতে কি একটা অনাথার ঠাঁই হবে না?

মরা মাটি

মধ্যবিত্ত জীবন। তার ওপর চাকুরী উপজীবিকা নয়, যার বাঁধা আয়ে, সংসারটা নিয়মিত ভাবে অন্ততঃ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও চলতে পারে। দালালী পেশা, অনির্দিষ্ট আয়। কোন মাসে হয়তো বেশ কিছু এসে যায়, এবং আসে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, অসম্ভব স্থান থেকে। ধরুন, যেমন, কবে কোন্ আত্মীয় টাকা ধার নিয়েছিলেন, কয়েকবার তাগাদা করে যার আশা সত্যসত্যই ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেই টাকাটা হঠাৎ তিনি নিজে এসে শোধ ক'রে দিলেন। ঠিক তার পর দিন একটা মনিঅর্ডার এসে গেল উনিশ টাকা বারো আনা; পাঠাচ্ছেন এক কোম্পানী, আমার কোন পুরানো দালালীর কন্ট্রাক্টের ওপর হঠাৎ এতদিন পরে

কিছু লেন-দেন হয়ে গেছে, তারই দালালী। এমনি ধারার ছোট-বড় পাওনা-গণ্ডায় মিলিয়ে রাই এবং বেল এক ক'রে বেশ বড় গোছের তাল হয়ে ওঠে। আবার কোন মাসে দেখা যায়, পাকা কারবারের দালালী, যাতে বিক্রেতা এবং ক্রেতা দু পক্ষই লাভবান হবে প্রচুর—সেখানেও হঠাৎ একটা খুঁটিনাটির জন্য লেন-দেন বন্ধ হয়ে গেল; এমন কি পাওনা পাকা বিল সাহেব পাশ করলে—হঠাৎ দেখা গেল পাশ করা বিলটা পাওয়া যাচ্ছে না, অবশেষে সে মাসটি পার ক'রে তবে সে বিল বম্বে কি মাদ্রাজ আপিস থেকে নোট-স্লিপ সহ ফিরে আসে, নোটে দেখা যায়— বিলটা বোধ হয় ভুলক্রমে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে জ্যোতিষ না মেনে উপায় কি? বন্ধুরা বলেন, কুসংস্কার। সাম্যবাদী লেখক বন্ধু তো আমাকে বলেন, পেটি বুর্জোয়া। তা' বলুন। কিন্তু জ্যোতিষী যখন হাত দেখে বলেন, আর কয়েকটা দিন—তারপরই রাজযোগ; তখন অবসাদ কাটিয়ে যে বল পাই তার তুলনা হয় না। তখন পুরানো পাওনাদারকে ওই মনোবলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হই যে আসছে মাসে নিশ্চয় পাবেন। যদিও জানি 'সব ঝুট্ হ্যায়' তবুও রাজযোগ-প্রলুব্ধ মন—চুপি চুপি বন্ধুবান্ধবদের ব্যঙ্গ ক'রে বলি—যা বলবি বলে নে। এর পর যখন রোলস্-রয়েস চড়ে যাব তখন দেখাব। কিন্তু রোলস-রয়েসবাহী জাহাজখানা প্রতিবারই ডুবে যায়।

এমত অবস্থায়, অর্থাৎ কয়েকবারই রাজযোগ ব্যর্থ হয়ে যাবার পরেও সেদিন দ্বারিক শর্মাচার্যের সম্মুখে হাতখানা প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললাম—দেখ তো।

হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করেই শর্মাচার্য শিউরে উঠল—ওরে বাপ রে!

—মানে?

গম্ভীর ভাবে শর্ম্মাচার্য বুড়ো আঙুলের নখ একটা রেখার উপর চালিয়ে দিয়ে বললে—এ যে উভচরী যোগ।

সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকালাম। দ্বারিক বললে—নৌকা তো জলেই চলে। কিন্তু এ যোগ যার থাকে—তার নৌকো ডাঙাতেও চলে। জলে স্থলে সমান আর কি।

বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল, কল্পনা নেত্রে দেখলাম—কলকাতার পিচের রাস্তার ওপর একখানা নৌকো—সর-সর শব্দে ছুটে চলেছে, লোকে—বিশেষ ক'রে আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে এই অভাবনীয় কাণ্ড—আর সেই নৌকোর ওপর বসে মৃদু মৃদু হাসছে যে ব্যক্তি—সে আমি!

তবে—শর্ম্মা বললে—তবে—

মুহূর্তে চলন্ত নৌকোখানা কাত হবার উপক্রম করলে। শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—তবে ?

—আর কিছু নয়, ভৃত্য-কষ্ট হবে বলে মনে হচ্ছে। ভৃত্যকষ্ট যোগ—এই যে।

নৌকোখানা মুহূর্তে সোজা হয়ে গেল। বললাম—দূর দূর!

কয়েকদিন পরই। ২০শে ডিসেম্বর রবিবার। সে দিন সন্ধ্যায় বেশ একটি শাঁসালো মাড়োয়ারী প্রবরকে এমন ভাবে লাভ দেখিয়ে এক ব্যবসায়ে নামালাম যে—যাতে বিশ হাজার রূপোর চাকতি—গড় গড় ক'রে আমার বাড়ীর দিকে গড়াতে শুরু ক'রে দেবে। মনে হ'ল জীবন-তরী জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কথাটা পাকা হয় হয় এমন সময় —সোঁ সোঁ শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। কোন মতে বাড়ী ফিরলাম রাত্রি দুটোয়। সমস্ত রাত্রি ঘুম হ'ল না। কেবলই ভাবছিলাম—এ কি

দুর্ভোগ? উভচরীযোগ ফলবতী হবার মুখেই—এ কি হ'ল? মন বার বার বললে—কেন ঘাবড়াচ্ছ? সাইরেন তো বাজেই, বাজবার জন্যেই তো ওটা তৈরী হয়েছে। আজ পর্যন্ত তো অনেক বার বেজেছে—ক'টা বোমা পড়েছে?

ভোরবেলাতেই উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম বড় রাস্তার ওপর। দেখি কি খবর!

রাস্তায় দেখলাম গবেষণার অন্ত নেই। শুনলাম, সত্য সত্যই পালে বাঘ অর্থাৎ বোমা পড়েছে। কেউ বলে পূর্বে, কেউ বলে, পশ্চিমে—কেউ বলে উত্তরে, কেউ বলে দক্ষিণে—একজন বললেন—আমার সোর্স রিলায়েবেল্—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে কলকাতার চারদিকে চারটি ছেড়ে পূণ্যাহ ক'রে গেছে। এর পরই বুঝলে কিনা—কে কি বুঝল জানি না, আমার বুকটা কিন্তু দমে গেল। আমার উভচরীযোগের নৌকাটা চালু হবার মুখেই টর্পেডো বোমায় ফাটবে নাকি? বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরলাম—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এসেই শুনলাম গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠ। বিস্মিত হলাম—শঙ্কিত হলাম। উপরে গিয়ে দেখলাম—একরাশ এঁটো বাসন নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন। সভয়ে প্রশ্ন করলাম—হ'ল কি?

উত্তর হ'ল—আমার মাথা।

আর প্রশ্ন করতে ভরসা পেলাম না।

তিনিই বললেন—পাশের বাড়ীর ঝি বলে গেল—আমাদের ঝি পালিয়েছে।

মনে মনে দ্বারিক শর্মার মুণ্ডপাত করতে করতেও তারিফ করলাম; ভৃত্য-কষ্টও ফলে গেছে। বললাম—তা হ'লে?

তিনি বললেন—তা হ'লে ফপর দালালী রেখে ঝি খুঁজে আন।

তাই বের হ'লাম। দু-তিন দিন ঘুরে আমার ধারণা হ'ল—অমোঘ

জ্যোতিষবাক্য। বিশেষ ক'রে খারাপ ফলগুলো। বর্তমানে আমার ভাগ্যে পত্নীপুত্র বিদ্যমানেও দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ সম্ভব, কিন্তু ঝি চাকর মিলবে না। সারি বেঁধে মোট পোঁটলা হাতে কলকাতা থেকে যখন ওই শ্রেণীর নরনারীকে পালাতে দেখলাম তখন মনে হ'ল আমার ভৃত্যকষ্টযোগই ওদের পেছনে পেছনে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে।

এমন সময় একদা। তারিখ বোধ হয় ২৫শে ডিসেম্বর। ২৪শে রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর—যখন উদরকে একমাত্র সত্য জেনে গৃহিণী রান্নাঘরে বসলেন বড় কলম নিয়ে এবং আমি বসলাম খাতা কলম নিয়ে ঠিক তখনই। কোন ধাতব নল বিনির্গত ধ্বনি—ও—শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠল। চমকে লাফ দিয়ে উঠলাম, গৃহিণী এমনভাবে ছুটে বেরিয়ে এলেন যে যদি আমাদের দেশে মেয়েরা মারহাট্টা মেয়েদের মত কাছা দিয়ে কাপড় পরত তবে কাছায় পা বেধে ধরাশায়িনী হতেন; বড় ছেলে চীৎকার ক'রে উঠল —বাবা গো!

মেজছেলে একটু তেজী—সে আকাশের দিকে ঘুঁষি তুলে বললে—বর্বর দস্যু। এবং নিরাপদ শূন্যলোকে দিলে প্রাণপণ জোরে ঘুঁষিটা হাঁকড়ে।

এমন সময় ধাতব 'ও' শব্দটির সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল—গো।

মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে এল, সাইরেন নয়, ও যন্ত্রটা ক্রমাগত ও—ও—ও—ই বলে গোঙায় বটে, কিন্তু তার ধ্বনি তো বেরোয় না। ওর নলি আছে, ঠোঁট আছে; তালু তো নেই। তবে এ মানুষের গলা। কোন রহস্যপরায়ণ শিশু-শয়তানের কাণ্ড। এমন সময় কড়াটাও নড়ে উঠল খট্‌খট্‌ শব্দে। এবার সর্বাগ্রে প্রজ্বলিতা হয়ে উঠলেন স্বয়ং গৃহিণী,—কে? কে! বলে প্রায় ছুটেই নেমে গেলেন নীচে। কিন্তু দরজা খোলার পরমুহূর্তেই তাঁর পুলকিত কৃতার্থ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—ওমা তুমি! আমরা মনে

করলাম কোন হতভাগা দুষ্টু ছেলে বুঝি মুখে সাইরেন বাজিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

সাইরেন-নিন্দী কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠল—সে কণ্ঠস্বর শুনে মনে হ'ল—ভাগ্যিস্ সাইরেন যন্ত্রের স্বর এক ঘাটে বাঁধা—সা রে গা মা নেই—সপ্তমে ওঠে না! রুক্ষ কণ্ঠস্বরে উত্তর শুনলাম—তোমার ঘরে তো গান গাইতে আসি নি বাছা—এসেছি কাজ করতে। তা গলা শুনে যদি পছন্দ না হয় তো দেখ।

এ কথার উত্তরে গৃহিণীর কাছ থেকে কঠিন বাক্য কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু বেকায়দার পরিস্থিতিটা চিরদিনই প্রায় ভোজবাজীর মত অঘটন ঘটায়, হাতীকে ব্যাঙে লাথি মারে, বাঘে কাঁকড়া খায়, মৃত্যুপতি যমকে রাবণ রাজার ঘোড়ার ঘাস কাটতে হয়—তাই কঠিন বাক্যের পরিবর্তে গৃহিণী অতি মোলায়েম ভাবে বললেন—রাগ করো না মা, ঠাট্টা করছিলাম। এসো—উপরে এসো।

—না, এমন ঠাট্টা আমি ভালবাসি না মা। বস্তীর ওই ড্যাকরাগুলো—দিন রাত সাইরেনী বলে বলে মাথা খারাপ ক'রে দিলে আমার। আমি বলি—ভগবান—জাপানী মুখপোড়াদের তো ডাকছি না আমি—আমার ডাকে তুই ওই ড্যাকরাদের মাথায় নাপিয়ে পড় হনুমানের মত। বলতে বলতেই গৃহিণীর পেছনে পেছনে উঠে এল এক অদ্ভুত মূর্তি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হিলহিলে কাঠির মত লম্বা, রোদ্দুরে শুকনো, ছ্যারা-কাটা, খসখসে, শ্যাওলায় কালো পড়ো বাড়ীর দেওয়ালের রঙের মত রঙ, মাথার তৈলহীন রুক্ষ চুলে আধ ছটাক ওজনের টম্যাটোর মত একটি এলো খোঁপা, অত্যন্ত ছোট দুটি চোখ—চোখের ক্ষেতের রঙ হলুদ; এই রূপের ওপর পরনে অত্যন্ত ময়লা ছেঁড়া একখানা কাপড়। পরনের কাপড় দেখে মনে মনে তার প্রশংসা করলাম—হ্যাঁ, শিল্পজ্ঞান আছে মেয়েটির।

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে—তুমিই বুঝি বাপু?

কথাটা ঠিক বুঝলাম না। আমার দৃষ্টি দেখে সে-কথা বুঝেই সে বললে—বাপু মানে বাবা গো!

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ—উনিই কর্ত্তা।

আমার পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম ক'রে সে বললে—কাল গঙ্গা-চানে গিয়ে মাগী বলছিল—ঝিয়ের কষ্টের কথা। শুনে মায়া হ'ল। ঠিকানাটা শুধিয়ে রেখেছিলাম। রাতে ভেবে দেখলাম—ভাল-মানুষের মেয়ে সত্যিই কষ্টে পড়েছে। তাই এনু। দিই চালিয়ে—তোমাদের ঝি ফিরলে—

গৃহিণী হাঁ-হাঁ ক'রে উঠে বললেন—কক্ষনো না—তাকে আর আমি নেব না। তোমাকে কক্ষনো আমি ছাড়ব না।

মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে সে জবাব দিলে—ওকথা সবাই বলে বাছা; ওই রামমিস্তির গলির বাবুদের বাড়ীর গিন্নীর অসুখে—মেথরানীর কাজ করেছিনু, ভাল হয়ে গিন্নী বলেছিল, তুই আমার পেটের মেয়ের কাজ করেছিস—তোকে যদি কখনও ছাড়াই তো আমার জাতের ঠিক নেই। তারপর ছ'মাস না যেতে একদিন রাগের মাথায় মুখের ওপর জবাব দিনু একটা—অমনি সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান দিয়ে বের ক'রে দিলে। নাও এখন কাজ কি, মাইনে কি তাই বল।

সরস আমের ফালির বৈশাখের এক রোদ্দুরে যে অবস্থা হয়—দেখলাম গৃহিণীর আমার মুখের অবস্থা তদ্রূপ—অর্থাৎ আমসীর মত। অপ্রতিভ এবং সশঙ্কিত ভাবে তিনি বললেন—এস মা—দেখ সব।

প্রবীণ উকীল যেমন ভাবে মামলার কাগজ দেখে, পাকা অডিটার যেমন ভাবে হিসেবের খাতা দেখে, ঘাগী পুলিশ অফিসার যেমন ভাবে খুন কি চুরির অকুস্থল তদন্ত করে—ঠিক তেমনি ভাবে সে কাজ কর্ম দেখে নিলে, বাড়ীতে ক'জন লোক—ক' দফা খায়। রান্নাবান্নার খাদ্য তালিকা

থেকে বাসন-কোসনের এবং পোড়া কড়া হাঁড়ির পরিমাণ জেনে নেওয়ার কৌশল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারপর যখন বললে—তোমাদের ছাই-পাঁশ এটো-কাঁটা ফেলবার জায়গাটা একটু দূর বাছা, তখন আমার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। এখানে আসবার পথে আগে থেকেই ডাষ্টবিনটা লক্ষ্য ক'রে এসেছে। বাপ রে, এ যে দেখি ঝি জগতে শার্লক হোমস্।

সকলের স্তম্ভিতভাবকে তীক্ষ্ন কণ্ঠের ধ্বনিতে চঞ্চল ক'রে সে বললে, তা, কাজ তোমার আমি ক'রে দেব মায়ী।

গৃহিণী বললেন—চব্বিশ ঘণ্টার কাজ যদি কর—

—না। অত্যন্ত তীক্ষ্ন স্বরে সে বললে—না, সে আমার পোষাবে নি। চব্বিশ ঘণ্টা মুনিব বাড়ীতে থাকা মানে চব্বিশ ঘণ্টাই বাঁদী হয়ে থাকা, তার চেয়ে কাজ কর্ম ক'রে আপন ঘরে যাব বাছা—তখন রাজার রাণীই বা কে আর আমিই বা কে?

বলে এক নিশ্বাসেই বললে—নাও—এখন দুটো পান দাও দেখি। মোটা ক'রে দাও।

পান নিয়ে বললে—জরদা দাও, জরদা।

গৃহিণী বের করলেন দোক্তার কৌটা।

দেখে সে বললে—ওমা, এ যে দোক্তা গো। জরদা খাওনা কেন তুমি? বলেই সে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।—বাপু, তুমি তো দেখি মানুষ সুবিধের নও বাপু। মায়ী দোক্তা খায়; তুমি জরদা এনে দিতে পার না বাপু?

আমি সভয়ে একটি আধুলি বের ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললাম—ও বেলায় তুমি নিয়ে এসো।

এবার সে ছোট্ট মেয়ের মত ছুটে গিয়ে বালিকাসুলভ ভঙ্গিতে গুাকাশ

ক'রে গৃহিণীকে বললে—এই দেখ মায়ী এই দেখ, একটা আধুলী আদায় ক'রেছি বাপুর কাছে। রূপোলী জরদা নিয়ে আসব—কাশীর জরদা—খুসবই কি দেখবে।

বলেই সে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল। আমি এবার প্রশ্ন করলাম—তোমার নাম কি মা?

—নাম?

—হ্যাঁ নাম?

এবার সে একটু হেসে ফেললে—বললে—নাম আমার অনেক বাপু! তবে মা-বাপে নাম রেখেছিল তুলসী।

বললাম—মানে নিছক তোষামোদ করেই বললাম—বাঃ বেশ নাম। তুলসী এবার হি-হি ক'রে হেসে উঠল। গৃহিণী ঘর থেকে ডাকলেন,—তুলসী!

সে কিন্তু উত্তর না দিয়েই চলে গেল। অগত্যা গৃহিণী আমাকে ধমকে উঠলেন—তুমি কালা না কি?

আমি একটু হাসলাম। কাল রাত্রেই যে তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলেছেন—আমি তাঁর ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি।

স্ত্রী বললেন—ডাক—ডাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসো না।

মুখ দেখে আর দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে ভরসা হ'ল না। ডাকলাম—তুলসী।

সে তখনও হি-হি ক'রে হাসছে এবং ঠিক দরজার মুখে। কিন্তু উত্তর দিলে না। তখন ডাকলাম, ওগো—ও মেয়ে।

এবার সে ফিরলে।—আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ, নইলে আর তুলসী বলে কাকে ডাকব।

এবার সে কি হাসি। যেন সাইরেনের চাবি খুলে দিয়ে লাফিং গ্যাস

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শেষে হাসি থামিয়ে বললে—পোড়া কপাল আমার, নইলে আর হাসছি কেন বাপু! মা-বাপে 'তুলসী' নাম দিয়েছিল—দুষ্টুমির জন্মে ডাকত 'ডাকিনী' বলে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—সে আমার বাহারের চেহারার জন্মে ডাকত 'কাকিনী' বলে। মিত্তির বাড়ীর গিন্নী বলত—নিশ্চয় তুই মুচীর মেয়ে—বলত 'মুচিনী'। এমনি চ্যাকচেঁকে গলার জন্মে কেউ বলে 'শাঁকিনী', কেউ বলে 'চিলিনী' আবার ওই বোমার ভেঁপু হবার পর থেকে পাড়ার মুখপোড়া ছেলেগুলো বলে 'সাইরেনী'। তুলসী ডাক শুনে উত্তর দেওয়ারই অভ্যেস নেই যে আমার।

একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। বললাম—সাইরেনী নামটা বুঝি পছন্দ নয় তোমার? তুমি রাগ কর?

—রাগ?

—হ্যাঁ। তখন বলছিলে—ভগবানকে বল—বোমা হয়ে ড্যাকরাদের মাথায় নাপিয়ে পড়।

—বোমা না, হনুমান হয়ে নাপিয়ে পড়তে বলি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ হনুমান। তা—হনুমান কেন?

—বোমা হয়ে পড়লে তো ভগবান একজনার মাথায় প'ড়ে নিজেই ফেটে যাবে বাপু। তাই বলি হনুমান হয়ে নাপিয়ে পড়, প'ড়ে আবার নাপিয়ে ওঠ, আবার পড়, আবার ওঠ—আবার পড়। ভগবান যে একটা, ড্যাকরা যে অনেক।

গৃহিণী গালে হাত দিয়ে বললেন—ধন্য মা তুমি, ধন্য।

তুলসী হেসে বললে—নাও এখন কি বলছিলে বল?

কিছুতেই আর গৃহিণী কি বলেছিলেন—সে কথা স্মরণ করতে পারলেন না।

সে বললে, মায়া যেন নেকা! বলেই সে চলে গেল।

বড় ছেলে বললে—সাংঘাতিক।

ছেলের মা বললেন—হোক বাবা সাংঘাতিক। ঝিয়ের কষ্ট থেকে তো বাঁচলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কান টানলে মাথা আসার মত ভৃত্যকষ্টের ভবিষ্যদ্বক্তার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে আক্রোশ-ভরে বললেন—তোমার দ্বারিক শর্মার এবার দেখা পেলে হয়। ভৃত্যকষ্ট! সব মিথ্যে কথা। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। কারণ, তা হ'লে আমার উভচরীযোগটা?

কয়েক দিন, মানে দিন পাঁচেক না যেতেই কিন্তু আশ্বস্ত হলাম। দ্বারিক অভ্রান্ত, কারণ ভৃত্যের অভাবে নয়—ভৃত্যের সংযোগে ভৃত্যকষ্টটা নিদারুণ হয়ে উঠল। বাড়ীটা প্রায় যেন মিলিটারী সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। ভোর বেলায় অত্যন্ত কঠোর স্বরে বাইরের কড়া বেজে ওঠে, এক মুহূর্ত বিলম্ব হ'লেই নিষ্ঠুর রুক্ষতায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে সাইরেন-কর্কশ কণ্ঠস্বর। ঝন ঝন ক'রে থালা বাসন, ঝাঁটার খসখস শব্দ শুনে বেড়ালে বেড়ালে ঝগড়া বাধাবার পূর্বাভাস—ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ—মনে পড়ে যায়; কয়লা ভাঙ্গার দুম দুম শব্দে, শিলের ওপর নোড়ার শব্দে এমন একটা কঠিন রুক্ষতার প্রভাব সংসারের ওপর বিস্তৃত হয় যে, শরীর সত্যই শিউরে উঠে। গৃহিণীকে এখন ছ'টার সময়েই উঠতে হয়, কারণ তুলসী বিছানা তুলতে এসে তাঁকে তখনও বিছানায় থাকতে দেখলে বলে—ওঠ না গা, সোয়ামী তোমার কত টাকা রোজগার করে যে বেলা দশটা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে? লক্ষ্মীছাড়ামি আমি দেখতে পারি না, ওঠ-ওঠ।

বিছানা-পত্র তুলেই খসখস শব্দে সে ঝাঁটা চালায় প্রায় ধূমকেতু যে বেগে তার প্যারাবোলার পথে ছোটে সেই বেগে, তারপর দুমদাম শব্দে আসবাব-পত্র সরিয়ে ভিজে ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছে ফেলে বেরিয়ে যায়

ঝড়ের মত, আমার ভয় হয় কোনদিন সমস্ত উল্টে ফেলে আমার সর্বনাশ করবে।

এর পরই সে যায় নীচে কলতলায় বাসন নিয়ে। বাসন মাজে আর বকে, আরম্ভ করে ভগবানকে নিয়ে—যে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, বলে, তুমি চোখের মাথা খেয়ো। তারপর মা-বাপকে অভিসম্পাত দেয়—যমরাজা যেন তোমাদের গাছে বেঁধে চাবুক মারে। সেখানেও যেন তোমাদের দাসীবৃত্তি করতে হয়।

তারপরই তে-তলার প্রতিবেশী গৃহিণীর সঙ্গে। তুলসী যে কলটায় বাসন মাজে সেটা বন্ধ না করলে তে-তলায় জল ওঠে না। প্রতিবেশী গৃহিণী—তাঁকে আমি দিদি বলি—তিনি ডেকে সবিনয়ে বললেন—ও মা তুলসী, কলটা একবার বন্ধ কর মা! একটু জল আসুক।

ব্যস, তুলসীর বাসন মাজার হাতের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে—অত্যন্ত তীক্ষ্মস্বরে সে চীৎকার করে—কেন—বন্ধ করব কেন? তোমার হুকুমে না কি? তুমি আমার মুনিব না কি? বলেই অবশ্য কলটা বন্ধ ক'রে দেয়; দিদি বড় মানুষ ভাল, তিনি হাসেন কিন্তু আমাদের লজ্জা হয়। তাই সেদিন গৃহিণী ধমক দেবার চেষ্টা করেছিলেন—আমার বাড়ী চাকরী করতে হ'লে ওঁকেই মানতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিয়েছিল—চার টাকা মাইনে তার চল্লিশটে মুনিব। ঝাড়ু মারি চাকরীর মুখে।

এর পর নিরুপায় হয়েই সব সহ্য করতে হয়। দিদিদের সঙ্গে বাক্য-বর্ষণের মধ্যেই সে হঠাৎ পাড়া মাথায় ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে—দাদা-বাবু—কে লোক ডাকছে!

তারপর তার আক্রোশ পড়ে আমাদের ওপর—দিনরাত লোক, দিনরাত লোক। কেন গা, এত লোক কিসের জন্যে? কি এমন লাটসাহেব রে

একদিন লোকের কামাই নেই? আমার গলা যে ফেটে গেল চীৎকার ক'রে?

আগন্তুকেরাও সঙ্কুচিত হন, আমারও লজ্জার সীমা থাকে না। এর পরই সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক পর্ব। বাড়ী থেকে আবর্জনা ফেলতে বের হয়েই সে পাড়ার কোন বাড়ীর ঝি বা চাকর বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিদারুণ আক্রোশে ঝগড়া আরম্ভ করে। যার ফলে প্রতিবেশী কয়েক বাড়ীই আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। একটি মাত্র ফল আমার কাছে ভাল হয়েছে, সেটি এই—পাশের বাড়ীরই একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে নিদারুণ নিষ্ঠার সঙ্গে গান শিখছিল—তার গান আরম্ভ হ'ত সকাল বেলাতেই। সে তার গান সভয়ে বন্ধ করেছে।

তুলসী তাকে বলেছিল—বলি তুই যে সকাল বেলা থেকে গান বাজনা আরম্ভ করেছিস—কোন্ রাজার বাড়ীতে তোর বিয়ে হবে শুনি? তার চেয়ে বাসন মাজ, কাপড় কাচ, রান্না কর, এর পরে কাজে লাগবে।

মেয়েটির মা প্রতিবাদ করেছিলেন, এ বিষয়ে পাড়ার মধ্যে তাঁর দৃঢ়তার খ্যাতি আছে। কিন্তু তুলসীর সাইরেন-নিন্দী তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর, সর্বোপরি জীবনের রুক্ষতার নিষ্ঠুর তীব্রতায় যত ধার তত জ্বালা! দাবী বা কারণ যার যত ন্যায়সঙ্গত হোক—ওর জ্বালাময়ী নিষ্ঠুরতার সম্মুখে কিছুই টেকে না।

এমনি ভাবে নিত্য নিয়মিত সে আমার সংসারে এবং সংসারের আশে-পাশে এক উত্তপ্ত প্রদাহময় আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে চলে যায়। কাজ শেষে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কাজের মধ্যেও মুহূর্তের অবকাশ মেলে না—যার মধ্যে ওর সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনার বাইরের কোন বিনিময় চলে। এমন কি যেদিন ও প্রথম এসেছিল—সেদিন ওর রুক্ষতা এবং কর্কশতাকে অতিক্রম ক'রে অতি অল্প সময়ের জন্যেও যে আর এক মূর্তি বেরিয়ে এসেছিল—সে আজ ভ্রান্তি বলে মনে হচ্ছে। সেটা হয়তো ওর মুখোশ, স্বরূপ নয়;

সভ্যতার ক্ষীণতম স্পর্শের এনামেলিং একদিনের কালক্ষয়েই নিঃশেষে উঠে মুছে গেছে।

আরও কিছু দিন পর। সেদিন ভোর বেলাতেই অভ্যাস মত উঠেছি, এমন সময় পথের উপর তুলসীর কণ্ঠস্বর ভীষণতম উত্তেজনায় রণ-রণ ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠল। ভোর বেলাতেই কোন্ প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করলে জানি না, কিন্তু আমার মনটা অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠল। ছি, ছি, ছি! প্রতিবেশী ভদ্র সজ্জনের সঙ্গে মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে! মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চড়বারই কথা। অনেক দিন আর শত্রু বিমান হানা দেয় নি! কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এ দিকে সোনা উঠছে লাফে লাফে একশোর কোঠায়, কাপড়ের জোড়া প্রথম দশক পার হয়েছে, চাল চল্লিশের কাছাকাছি; কণ্ট্রোলের দোকানে কিউ দিয়ে দাঁড়ালে আহার্য কোনক্রমে মিললেও পিত্ত রক্ষা হয় না। ময়দা মেলে না, চিনির দুর্লভতায় বাংলাদেশে ডায়বিটিস রোগীর সংখ্যা কমে আসছে, নুনের দর বেড়েছে, তার ওপর এ দেশের মানুষ অমৃতের পুত্র; তাই মরেও যাচ্ছে না, দোরে দোরে ঝি-চাকরের ঘোরাঘুরি বেড়েছে। এমত অবস্থায় জাগতিক নীতি অনুসারে তুলসীর দর কমে এসেছে। হাতে টাকা থাকলে পুরনো জুতোর কাঁটা ওঠার অপরাধের মতই আজকের চীৎকার আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। একপাল ছাগল এবং তার রক্ষক তিনজন মুসলমানের সঙ্গে একা তুলসী দুর্দান্তভাবে বচসা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ছাগওয়ালারা সকালবেলায় এখানে দুধ বিক্রী করতে আসে, আজ তাদের একটা ছাগলের পাশ দিয়ে ধাবমান তুলসীর জীর্ণ কাপড়খানা ছাগলটার শিংয়ে বেধে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে। তুলসী ছাগলটার কান ধরে অবিরাম পিটছে এবং ছাগওয়ালাদের অভিসম্পাত দিচ্ছে।

ক্রোধের ওপর বিস্ময় জেগে উঠল, প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষ, বিশেষ ক'রে নারী কেমন ক'রে জীবনের সর্ববিধ রসমাধুর্যশূন্য হয়ে এমন হতে পারে ভেবে পেলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আমার দেশের মাটির কথা, সেখানে দেখেছি এক-একটা জায়গায় মাটি মরে পাথর হয়ে যায়। বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে গিয়ে পড়ে থাকে বালির রাশি—ক্রমে সেই বালি জমে এক অখণ্ড পাথরের স্তরে পরিণত হয়, ঘাস জন্মায় না, সামান্য অসাবধানতায়, তার উপর পদক্ষেপ একটু অসতর্ক হলেই হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বসিয়ে রক্তপাত ক'রে দেয়, পায়ে জুতা থাকলে—কঠিন পদক্ষেপের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি বের হয়—তুলসী যেন তাই। মনে মনে ভাবলাম—এ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই ভাল। এরই মধ্যে জীবনের রসবোধ যেন শুকিয়ে এসেছে, রসিকতার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রকাশভঙ্গি হারিয়ে ফেলেছি।

স্ত্রীকে বললাম। চামুণ্ডাভীতা দৈত্যকুলবধূর মতই সভয়ে বললেন—ওরে বাপ রে! আমি পারব না, তুমি পার তো দেখ।

সংকল্প দৃঢ় ক'রে বসে রইলাম। অন্ততঃ এ বেলার কাজকর্মটা হয়ে যাক। মনে মনে মতলব করতে লাগলাম—কি ভাবে কথা আরম্ভ করব। —"দেখ বাছা"!—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে কল্পনার তুলসী উত্তর দিয়ে উঠল—আদিখ্যেতায় কাজ কি? চাকর আর মুনিব—তার আবার বাছা! সোজাসুজি বল না কি বলছ?

—ওগো বাপু! চমকে উঠলাম, দেখলাম তুলসী ঝাঁটা হাতে ঘরে ঢুকেছে—ওঠ, ঘরটা পরিষ্কার করে দি। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠল—তুমি এমন নোংরা কেন গা? সিগারেট বিড়ির ছাইয়ে ঘরটা ভরিয়ে রেখেছ? চার টাকা মাইনের ঠিকে-ঝি, কেন, এত করব কেন? পাঁচ সিকের জুতো তার আবার ঘোড়তোলা! কাল থেকে যদি এমনি জঞ্জাল

ক'রে রাখ তো জবাব দিয়ে চলে যাব আমি।

বলেই সে আসবাব-পত্রগুলো অভ্যাস মত দুম-দাম শব্দে সরাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

তৎক্ষণাৎ আমার মুখে এসে গেল—তার আগে আজই তোমার জবাব দিলাম আমি। কিন্তু বলা হ'ল না। তার আগেই একখানা ভারী চৌকী তার ওই তাণ্ডব আকর্ষণে কঠিন শব্দ ক'রে সজোরে গিয়ে পড়ল তার পায়ের বাঁশী অর্থাৎ সামনের হাড়ের উপর। চৌকীখানার ওপর মুখ রেখে সে বসে পড়ল। শব্দের কাঠিন্যে আমার সর্বশরীরে বেদনানুভূতির একটা প্রবাহ খেলে গেল। মনুষ্যত্বের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারজাত প্রবৃত্তি মুহূর্তে জেগে উঠে এই কয়েক দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিরূপতাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে ডাকলাম—তুলসী! তুলসী!

চৌকীখানা থেকে মুখ না তুলেই—হাত দিয়ে আমার হাতখানাকে সরিয়ে দিলে। তার মধ্যে উপেক্ষা বা আমার মমতার প্রতি তার অনিচ্ছার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। আমি সরে এলাম—তবুও বললাম—বড্ড লেগেছে, না মা তুলসী?

সে এবার মুখ তুললে; মুখের ওপর জানালা দিয়ে রৌদ্রের ঝলক প্রতিভাত হয়ে উঠল, দেখলাম তার ঘোলাটে চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি; তেমন দীপ্তি আমি আমার জীবনে দেখি নি। ভয় পেলাম। সভয়েই বললাম—বড্ড লেগেছে রে, আমি বুঝতে পারছি।

মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়াল। আবার তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসবাব-পত্র সরিয়ে কাজকর্মগুলি ক'রে বেরিয়ে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে শুধু ভাবছিলাম—মানুষ মাটিকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে—তৈরী করে ইট, সেই ইটের কাঠামোর তৈরী করা বাড়ী ঘর—সেও ধ্বনির

আঘাতে প্রতিধ্বনি তোলে, কিন্তু মানুষের মন যখন মরে, তখন তার সে শক্তিও থাকে না।

তুলসীর কণ্ঠস্বরেই চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।—আমি আর কাল থেকে কাজকর্ম করতে আসব নি। তোমরা নোক দেখে নিয়ো।

স্ত্রী ডাকলেন—সে কি, ও তুলসী!

আমিও বেরিয়ে গেলাম। তুলসী তখন নীচে নামছে। নামতে নামতেই উত্তর দিলে—না।

আমি ডাকলাম—তুলসী।

দরজার মুখে বেরিয়ে যেতে যেতে সে উত্তর দিলে—না।

তুলসী গেল। যাওয়াই চেয়েছিলাম, কিন্তু তবুও মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। স্ত্রী বলেন একটা কথা—"ভাত থাকলে কাকের অভাব হয় না।" বিশেষ ক'রে চল্লিশ টাকা মণে ভাত যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে তখন অন্ন-প্রত্যাশীর অভাব হয় নি। এ মানুষটি ভাল। বেশ মিষ্টভাষিণী, তার ওপর মেয়েটির বেশ একটি শ্রী আছে। যার ফলে জীবনযাত্রা আবার বেশ সহজ হয়ে উঠল। ওদিকে তুলসী যাবার পর দিনই প্রতিবেশিনীদের জানালাগুলি দীর্ঘ দিন পরে খুলে গেছে। সে দিন সবাই একই প্রশ্ন করে-ছিলেন—পাপ বিদেয় করেছেন তা হ'লে? পাপ বিতাড়নের পুণ্যফলের ওজন এবং আকারের পরিমাণ দেখে আস্তিকতার প্রতি আস্থা এবং আসক্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে।

এমত সময় একদা আবার ঝি পালাল। গল্পটা অবশ্য জোরালো হ'ত—যদি সে চুরি ক'রে বা কোন অনিষ্ট ক'রে পালাত, এবং তাতে বৈপরীত্যের কৌশলে তুলসী খুব ফুটে উঠতে পারত, কিন্তু ঝি-টা সে সুযোগ আমাকে দিলে না—আর আমিও মিথ্যা ক'রে সে কথা লিখব না।

স্ত্রী বললেন—তুমি তুলসীকেই দেখ।

আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর মুখ দেখে প্রতিবাদ করতে সাহস হ'ল না। তুলসীর খোঁজেই বের হলাম। খালের ধারে বস্তিতে থাকে সে এইটুকুই জানতাম। ওটুকু অবশ্য যথেষ্ট নয় তবু তুলসীর বহু নাম-গুলোর কথা স্মরণ ক'রে ভরসা হ'ল—বহুজনেই তাকে চেনে; তা ছাড়াও ভরসা করলাম—তুলসীর কণ্ঠস্বরের উপর; এবং বেরিয়ে পড়লাম।

আমার প্রথম অনুমান মিথ্যা নয়। তুলসী সর্বজনবিদিতা। কিন্তু তুলসীর সাড়া পেলাম না। ওখানকার অধিবাসীরাও আমার কথায় তুলসীকে স্মরণ ক'রে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে—বাড়ী তো এই গলি দিয়ে গিয়ে—ডান হাতি বেঁকে—আবার ডানহাতি বেঁকে খানিকটা গিয়েই বাঁদিকে প্রথম যে গলি—সে গলিতে। কিন্তু ক'দিন তো তাকে দেখি নি। তার গলাও শুনি নি! উঠে গেল কি না জানি না।

খুঁজে গিয়ে উঠলাম তুলসীর বাড়ীতে।

বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা। বললে—তার তো অসুখ বাবু।

—অসুখ?

—হ্যাঁ। আজ দিন দশ হ'ল—জ্বর।

ফিরলাম। অকস্মাৎ ভেতর থেকে তুলসীর সাইরেন কণ্ঠ—অত্যন্ত দুর্বল অবশ্য, শুনতে পেলাম—মাসী। ওই দুর্বলতাটুকুই আমার মনে একটু করুণার সৃষ্টি করলে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে আসছি, পিছন থেকে ডাকলে সেই বৃদ্ধা।—বাবু! তুলসী তোমাকে একবার ডাকছে।

ভেতরে গেলাম। তুলসীর ঘরের ভেতর গিয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। ওই কুৎসিত-দর্শনা মেয়েটা, যার ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে, রুক্ষ চুলের মধ্যে এক বিকৃত অপকর্ষ রুচি মানুষকে পীড়া দেয়, তার ঘরের মধ্যে একি

সুচারু সজ্জা, একি সুচারু প্রকাশ! যার জন্য ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখতে বাধ্য হলাম তার ঘরের সাজ সরঞ্জাম—রুগ্ন পীড়িত মানুষটাকে দেখতে ভুলে গেলাম।

পুরনো আমলের খাটের ওপর ধপধপে পুরু বিছানা, মাথার দিকে দুটি ঝালর দেওয়া বালিশ, দুটি সুডৌল পাশ বালিশ। ছিটে বেড়ার দেওয়ালের খুঁটির পেরেকে ক'খানি ছবি। একদিকে তকতকে কতকগুলি বাসন।

—বাপু! ক্ষীণ স্বরে তুলসী ডাকলে, তার ডাকেই ঘরের সাজসজ্জা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার দিকে তাকালাম। সে খাটে শুয়ে ছিল না, মেঝের উপর একটা জীর্ণ মলিন বিছানায় সে শুয়েছিল। শীর্ণ দেহ আরও শীর্ণ হয়েছে—শ্রীহীন মুখ রোগে শুকিয়ে এমন হয়েছে যে মন রীতিমত পীড়িত হয়ে ওঠে। মমতার সঙ্গেই উত্তর দিলাম—অসুখ হয়েছে মা?

—বড় দাহ বাপু। শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আজ দশ দিন।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—না।

'ডাক্তার দেখিয়ো' বলতে পারলাম না। মনে হ'ল ফিয়ের কথা, বর্তমানে ওষুধপত্রের দামের কথা, মনে হ'ল তুলসীর কৃপণতার কথা, ঘরের এই আসবাবপত্র সত্ত্বেও সে জীর্ণ কাপড় পরে থাকে, মাথায় সে তেল দেয় না। আর মনে হ'ল তার রুক্ষ মেজাজ ও কটুভাষার কথা।

তুলসীই বললে—মায়ী ভাল আছে? দাদাবাবুরা, দিদিমণি ভাল আছে?

—হাঁ।

—ঝি পেয়েছ?

ব্যগ্রভাবে বললাম—সেইজন্যেই তো এসেছিলাম তোমার কাছে।

সে বললে—আর হয় তো হবে না বাপু। এবার আর—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম—না—না—না।

সে বললে—যদি বাঁচি তো যাব আবার।

বন্ধু ডাক্তার ভট্টাচার্যের কথা হঠাৎ মনে হ'ল। বন্ধুত্বের সুযোগে মহত্ত্ব প্রকাশের প্রবৃত্তি জেগে উঠল, বললাম—কাল আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। ভয় নেই তোমার।

—নাঃ। বাঁচি তো এমনিই বাঁচব। আর বেঁচেই বা কি হবে? দুঃখ আর কত করব?

উত্তরে কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম—মেঝেতে না শুয়ে খাটে শোও না কেন? এতে যে ঠাণ্ডা লাগবে!

—নাঃ—বিছানা ময়লা হয়ে যাবে।

অদ্ভুত! কি বলব? বরং একটু হাসিই এল। মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলাম। মুখ ফেরাতেই হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল একখানা ছবির দিকে। এক-খানা বাঁধানো ফটো। একটি তরুণ আর একটি তরুণী।

তুলসী বলছিল—বাপু, সেদিন জবাব দিয়ে এসে আমার দুঃখু হয়েছিল। ভারি দুঃখু হয়েছিল!

রোগের উত্তাপে ওর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই গেল—জান বাপু, কেউ মায়া-ছেদ্দা করলে আমার ভারি মন্দ হয়। মনে হয় ফাঁকি দেবার জন্যে ভোলাচ্ছে আমায়, শেষ কালে হয় তো বাকী ফেলে মাইনে দেবে না। পেরথম পেরথম ওই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কত জন যে ফাঁকি দিয়েছে! মাইনে তো দেয়ই নাই, কত জন টাকা ধার নিয়ে তাও দেয় নাই।

আমি একদৃষ্টে দেখছিলাম ছবির তরুণীটিকে। পাঁচ-পাঁচী শ্রীমতী একটি তরুণীর মুখে একটু হাসির রেখা, সুকোমল সলজ্জ হাসি—সে হাসি দেখে মায়া হয়।

সে তখনও বলছিল—জবাব দিয়ে এসে মনে হয়েছে, তুমি ফাঁকি দিতে

না। তেমন মানুষ তুমি নও। আর সত্যি মিথ্যে মন তো খানিক খানিক বুঝতে পারে।

তরুণীটির মুখখানি যেন কোথায় দেখেছি! কোথায়?

—ছবিটি দেখছ বাপু?

তুলসী বোধ হয় আমার দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখেছিল আমি তাকিয়ে রয়েছি ওই ছবিখানার দিকে।

ও কি তুলসী? ছবির মুখের সঙ্গে মেলাবার জন্যেই ফিরে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে মুহূর্তে সে ওই প্রশ্নটা শেষ করেছে। দেখলাম অকস্মাৎ তার মুখে এক অপূর্ব হাসি ফুটে উঠেছে। নিজের চোখে না দেখলে তুলসীর মুখে এ হাসি কল্পনা করা অসম্ভব। হ্যাঁ অসম্ভব। আবার একবার ছবির দিকে চেয়ে তুলসীর মুখের দিকে তাকালাম।

ওর মুখে হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে।

অহেতুক

ওঠ না গো! বলি, শুনছ? ঘোষ-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন। ঘোষের চোখে তখনও ঘুমের আমেজ; পরিপূর্ণ বিশ্রামের আরামের ঘোরে মস্তিষ্ক থেকে সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়ু-শিরা তখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। জাগ্রত পৃথিবীর কর্মকলরব দূরের বাঁশীর আওয়াজ না হোক আশ্বিনের ভোরের দূরবর্তী চণ্ডীমণ্ডপের ঢাকের বাজনার মত মনে হচ্ছে বলা যেতে পারে। তবুও ঘোষ যেন বুঝতে পারলে, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির মত বেসুরো। সে দেহে মনে চেতনার বেগ সঞ্চার করবার জন্যে পাশ ফিরে বললে, হুঁ। উঠি।

আবার পাশ ফিরে শুলে যে? কি ধারার মানুষ তুমি গা? পিরথিমী জাগল আর তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছ? একটু লজ্জা করে না তোমার?

ঘোষ সচকিত হয়ে আর একটা পাশ ফিরে আড়ামোড়া দিলে— একবার একটা ঝাঁকি দিয়েই সে উঠে বসবে। কিন্তু তার পূর্বেই ঘোষ গৃহিণী তীব্রস্বরে বলে উঠল, কি কপাল রে আমার, কি নেকন! মনে হয় কপালে মারি খ্যাংরার মুড়ো। ঘর-সংসারের মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে উঠি গে!

ঘোষ অবিলম্বে উঠে বেরিয়ে এল। দেখলে, প্রাত্যহিক শয্যাত্যাগের সময় অতিক্রান্ত তো হয়ই নি, বরং খানিকটা বেশি সকালই বলতে হবে। তবু সে মুখে যথেষ্ট অপ্রতিভতার ভাব টেনে এনে বললে, এঃ! তাই তো!

গৃহিণী বাজারের থলেটা ছুঁড়ে সামনে ফেলে দিয়ে বললে, সংসারে এত লোক মরে, আমি মরি না!

কাল সন্ধ্যেতে তো বাজার ক'রে এনেছি।—কুণ্ঠিতভাবে অপরাধীর মতই ঘোষ কথাটা বললে। ঘোষ-গৃহিণী এ কথার কোন জবাবই দিলে না। কাল বিকেলে তিনটের 'শো'তে স্বামী-স্ত্রীতে থিয়েটারে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরবার পথে গৃহিণীর পছন্দ মতই বাজার ক'রে আনা হয়েছে। দেড় টাকার বাজার। তার ওপর গঙ্গার ঘাট থেকে টাট্‌কা ইলিশ এসেছে এক টাকা দিয়ে; সেও গৃহিণীর ফরমাশ মত। স্বামী-স্ত্রী দুটি প্রাণীর সংসার, আক্রাগণ্ডা যতই হোক, এখন অন্ততঃ দুটো দিন বাজারে যেতে হবে না। মাছটা কুটে অবশ্য গৃহিণী বাড়ির অন্য গৃহস্থদের কিছু বিলিয়েছেন, তবু মাছও আজ আনতে হবে না।

স্বামীর কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘোষ-পত্নী হন হন ক'রে এগিয়ে গেল কয়লা-ঘুঁটে রাখবার জায়গাটার দিকে; গাদার ওপরেই কে—হয় তিনি নিজে অথবা ঠিকে ঝি-টা, কয়লার টুকরিটা উপুড় ক'রে রেখেছিল।

এটা থাকে গাদার পাশে সোজা মুখে। ঘোষ-পত্নী কয়লার টুকরিটা তুলে নিয়ে পাঁচিল পার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এইটে হয়েছে একটা আপদ। কোনদিন এখানে, কোনদিন ওখানে, কোনদিন সেখানে; এর পর কোন্‌দিন গিয়ে উঠবে ভাতের হাঁড়ির মুখে কিংবা লক্ষ্মীর আসনের ওপর। যাক, আপদ যাক, বিদেয় হোক।

সন্তান-সন্ততিহীন, তৃতীয়-আত্মীয়হীন, দুটি প্রাণীর সংসার। তকতকে উঠোনে অর্থাৎ তিন হাত বাই পাঁচ হাত এককালি খোলা বারান্দার ওপরে ঘোষের একটি টুল পাতাই আছে, সেটা এক ইঞ্চি সরে না; সেইটের ওপর ঘোষ সকালে বিকেলে বসে। ঘোষ টুলটার ওপরে বসে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সে ম্লান হাসি হাসলে। তার স্ত্রীর এমন ধারার অকারণ রুক্ষ ব্যবহার একবিন্দু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার বয়স হ'ল চল্লিশ, স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ। বোধ হয় স্ত্রীর বয়স যখন পঁচিশ তখন থেকে এই দশ বৎসর ধ'রে তার ধারা-ধরন এমনই। মাথায় কোন রকম বিকৃতি ঘ'টে গেছে। ঘোষ চিকিৎসা অনেক করিয়েছে, এখনও সে মস্তিষ্কশীতলকারী দামী তেল নিয়মিতভাবে স্ত্রীকে মাখিয়ে আসছে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

ঘোষ ভাল ঘরের ছেলে। ভাল ঘর মানে, ঘোষ-বংশ কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর বনেদী মধ্যবিত্ত বংশ। তাদের দু' পুরুষ কলকাতার বড় ইংরেজী ফার্মে বড় চাকরি করেছে। এ পুরুষেও তারা সবাই চাকরে। লেখাপড়ার ধার তারা বড় ধারে না, স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা ক'রে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। ডিগ্রী না থাকার জন্যে চাকরি পাওয়ার তাদের কোন অসুবিধা হয় না; তিন পুরুষ ধ'রে তারা যে পথে যাতায়াত করছে, সে পথের ওপর কেউ কাঁটা দিতে পারে না। ঘোষেদের নিজের বাড়ি আছে, পাঁচ ভাইয়ের এজমালী বাড়ি। খান পনেরো ঘর, দোতলার ছাদটাও

যথেষ্ট প্রশস্ত, অ্যাসবেস্টস দিয়ে পাঁচখানা রান্নাঘর হয়েও অনেকটা স্থান প'ড়ে আছে। চার ভাইয়ের সংসারে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, জমজমাট সংসার; বাড়িতে ঠাকুরদালান আছে, পূজো-পার্বণ হয়; কিন্তু তবু ঘোষ ভাড়া বাড়িতে বাস করে। একমালী বাড়ির অংশ সে অন্য ভাইদের বিক্রি ক'রে দিয়েছে। ঘোষ রেস খেলে না, তার পান-দোষ বা অন্য কোন দোষ নেই, শেয়ারমার্কেটেও কোনদিন শেয়ার কেনা-বেচা ক'রে ঋণগ্রস্ত হয় নি, তবু সে বাড়ি বেচে দিয়েছে। ওই স্ত্রীর জন্যই বেচেছে। কিছুতেই সে ও বাড়িতে থাকতে রাজি হয় নি। ও বাড়ির কলরব-কচকচি তার মস্তিষ্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। বাধ্য হয়ে ঘোষ বাড়ি বিক্রি ক'রে এই বাড়িতে বাসা নিয়েছে। তেতলা বাড়ি! তেতলায় থাকে খোদ বাড়িওয়ালা, দোতলায় থাকে একজন অধ্যাপক, একেবারে নীচের তলায় চারখানা ঘর দু'ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে থাকে একটি অল্পবয়সী দম্পতি ও তাদের তিনটি ছোট ছেলে, অপর ভাগে থাকে সস্ত্রীক ঘোষ।

তেতলার বারান্দা থেকে হাঁক এল, নীচের কলটা বন্ধ ক'রে দিন। তেতলায় জল আপনি ওঠে না, দোতলা পর্যন্ত ওঠে; তেতলায় জল ওঠে হ্যাণ্ডপাম্পে, বাড়িওয়ালার স্ত্রী পুত্র-কন্যা-বধূ সকলে পালা ক'রে পাম্প ঠেলেন, জলও ওঠে, প্রাতঃকালীন ব্যায়ামও হয়। কিন্তু নীচের তলায় কল খোলা থাকলে, পাম্পটা ঠেলে ভেঙে ফেললেও জল ওঠে না। নিত্যনিয়মিত সকালে জলসমস্যা দেখা দেয় বাড়িতে—প্রথম থেকেই হাঁক ওঠে, নীচের কল বন্ধ কর।

মেজাজ ভাল থাকলে ঘোষ-গৃহিণী কল বন্ধ ক'রে দেয়, মেজাজ ভাল না থাকলে প্রতিবাদ করে। আজ সে নিজের কলটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে বললে, বলি, কেন গা, কল বন্ধ করব কেন? কল বন্ধ করলে আমার চলবে কি ক'রে?

বাড়িওয়ালার মেয়েটি বড় ভালমানুষ মেয়ে, মিষ্টস্বভাবের জন্য সকলেরই প্রিয়, ঘোষ-গৃহিণীর সঙ্গে তার প্রীতি যথেষ্ট, ঘোষ-গৃহিণী মাথা ধরলে সে এসে শিঁয়রে বসে, বাতাস করে, শুশ্রূষা করে। বাড়িতে যা কিছু আসে, ঘোষ-গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে ডেকে তাকে খাওয়ায়। এবার সেই মেয়েটি কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেশ একটু কাকুতি সঞ্চার ক'রে বললে, ওপরে এক ফোঁটা জল হয় নি বউদি।

তার আমি কি করব? আমি এর পর রাস্তায় জল ধরতে যাব? না গঙ্গায় যাব?

ঘোষ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, আমাদের চৌবাচ্চা তো প্রায় ভ'রে গেছে—

ভ'রে গেছে? যাক ভ'রে, আমার জল আমি ফেলে দোবো! নর্দমায় ঢেলে দোবো।

তেতলা থেকে বাড়িওয়ালার গৃহিণী এবার ডেকে বললেন, কলটা একবার বন্ধ ক'রে দাও না মা। অ ঘোষ-বউমা!

ঘোষ-বউমা জ্ব'লে উঠল—বউমা? কিসের বউমা? আপনারা বামুন, আমরা কায়েত, বউমা কিসের? ভাড়া দিই, বাড়িতে থাকি; আর বউমা কিসের, কলই বা বন্ধ ক'রব কেন?

এ কথার জবাব বাড়ীতে কেউ ভেবে পেলে না। সব চুপ হয়ে গেল।

দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রী মৃদু উত্তেজিত স্বরে সমালোচনা করছিল —কি মেয়ে মা! ছি! ছি! ছি! তাকে মধ্যে মধ্যে জলের জন্য ভুগতে হয়, আজও ভুগতে হবে, নীচের কল খোলা থাকলে দোতলাতেও জল ওঠে না। আজ তারও জল হবে না। ছি-ছিক্কার করেও অধ্যাপক-গৃহিণীর পরিতুষ্টি হ'ল না, একটু থেমে বললে, অনেক ঝগড়াটে দেখেছি,

এমন দেখি নি। আবার বললে, অত্যন্ত হিংসুটে, বদমাইস, বজ্জাত। আবার বললে, পাজী, ছোটলোক।

কথাগুলো ঘোষ-গৃহিণীর শুনতে পাবার কথা নয়, মুহুস্বরের কথা। কিন্তু ওদিকে তেতলার উচ্চতাহেতু ঘোষ-গৃহিণীর মন তেতলা থেকে দোতলায় নেমে এল ঠিক সেই মুহূর্তে। সে বললে, তেতলায় জল নেই, আমায় কল বন্ধ করতে হবে। এর পর হাঁক আসবে দোতলার। পণ্ডিতলোকেরা, বিদ্বানমানুষেরা সাবান মাখবেন, তিনবার ক'রে চান করবেন; চৌবাচ্চাসুদ্ধ জল হুড়হুড় ক'রে ছেড়ে দেবেন, বাসি জলে চান করলে মাথা ভার হবে, গায়ে-হাতে ব্যথা করবে, অসুখ করবে। রোজ টাটকা জল চাই। আমাকে কল বন্ধ করতে হবে। কেন কিসের জন্যে? বন্ধ করব না কল।

বাইরের দরজার কড়া ন'ড়ে উঠল।

ঘোষ সাড়া দিলে, কে?

ওপাশ থেকে সাড়া এল না, কিন্তু কড়া আবার নড়ল।

এবার গৃহিণী বললে, কে? কে? সাড়া দাও না কেন? উত্তেজনা-ভরেই সে দরজা খুলে ফেললে। দাঁড়িয়ে ছিল পাশের বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে। সে বললে, মা গঙ্গা নাইতে যাচ্ছেন, আপনাকে বলতে বললেন।

বেশ, বলা হ'ল, এইবার চলে যাও।

মেয়েটি অবাক খুব হ'ল না, একটু বিরক্ত হ'ল। বললে, আপনি মাকে বলেছিলেন ডাকতে, তাই—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘোষ-গিন্নী বললে, ঘাট মানছি মা, ঘাট মানছি। হ'ল তো? ব'লে সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা তার মুখের ওপরেই বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর আলনার কাপড়গুলো অকারণে টেনে নামিয়ে

ফেলে, আবার পাট করতে করতে বললে, আমি কানাও নই, খোঁড়াও নই, গঙ্গার পথও না-চেনা নই ; আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন !

ঘোষ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আজ যে শেষ পর্যন্ত কি হবে, সে তা ভেবেই পেলে না। জীবন তাদের অস্বাভাবিকই বটে, কিন্তু আজকের এ অস্বাভাবিকতার মাত্রা উত্তরোত্তর ছাড়িয়ে চলেছে।

কাপড়গুলো আবার গুছিয়ে রেখে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে গৃহিণী আবার আরম্ভ করলে, বাঁচতে আর একদণ্ড ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে হয় না যে, ঘর-সংসার করি। যম ভুলেছে আমাকে। সকালে উঠে যে গঙ্গাস্নানে যাব, তার উপায় নেই।

ব'লে সে তেলের বাটি গামছা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল। ব'লে গেল, দেখো, যেন ভাতটা পুড়ে না যায়। আমার কপাল পুড়িয়ে রেখো না।

ঘোষ সর্বাগ্রে কলটা বন্ধ ক'রে দিলে। ডাকলে, চাঁপা !

চাঁপা বাড়িওয়ালার মেয়ে। সে সাড়া দিলে, কি ?

কল বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

দরকার নেই, আমরা নীচের এ পাশের চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে নিয়েছি।

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত ঘোষ বললে, দোতালায় ব'লে দাও তা হ'লে।

ওঁরাও নিয়েছেন।

ঘোষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এ দুর্ভোগ তার সমস্ত জীবন-ব্যাপী দুর্ভোগ। এর আর অন্ত নেই ! জীবনে এটা তার সহ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে এক-একদিন এমনিই দুর্ভোগ আসে, সেদিন সহ্য করা তারও পক্ষে কঠিন হয়। ইচ্ছে হয়—। নিজের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে

হয়। স্ত্রীর মৃত্যু হোক—এই কামনা সেদিন বার বার তার অন্তরে অত্যন্ত অবাধ্যভাবে উঁকি মারে। সমস্ত জীবনটা সে ওরই জন্যে নিয়োজিত করেছে। আত্মীয়স্বজন ছেড়েছে, বাপ-পিতামহের ভিটে, নিজের বাড়ি ছেড়েছে। নতুন বাড়ি করলে তার অন্তে আইন অনুসারে ভাই বা ভাইপো মালিক হবে, সেইজন্যে নগদ টাকা সে ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামেই রেখে দিয়েছে। জীবনে তার বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত নেই। আপিসে যায়, আপিস থেকে ফিরে সে ওই অপ্রিয়ভাষিণী বিকৃতমস্তিষ্কার মনোরঞ্জন করে। তবু তার এতটুকু উপশম নেই, তার দিক থেকে এতটুকু মার্জনা নেই, বিবেচনা নেই।

এক-একদিন বেশ থাকে, হাসিমুখে ওঠে; সমগ্র বাড়ির লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলে। নিজেই ডেকে প্রশ্ন করে, ও চাঁপা! জল হ'ল ভাই? কল আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রীকে ডেকে বলে, ও দিদি, আপনার কল খুলে দিন।

তেতলায়, দোতলায় যেখানে হাস্যধ্বনি উঠুক, সে হাসির রেশ কানে আসতে কারণ না জেনেই সে হাসতে আরম্ভ করে, ডেকে প্রশ্ন করে, ও চাঁপা ভাই! ও দোতলার দিদি! হ'ল কি? হাসছেন কেন?

কেউ প'ড়ে গেলেও মানুষ হাসে, কিন্তু হাসিটা সেখানে সম্পূর্ণরূপে চোখের কৌতুক; কৌতুক হিসাবে অর্থহীন, এমন কি মানুষ প'ড়ে যাওয়ায় হাসাটা হৃদয়হীনতা ব'লেই মনে হয়। ঘোষ-গৃহিণী কিন্তু সেদিন শুনেও, যারা চোখে দেখে হাসে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসে।

সেদিন তাদের নিকটতম প্রতিবেশী, নীচের তলার পাশের দুখানা ঘরের ভাড়াটে তরুণ দম্পতির প্যাঁকাটির মত কাঁদুনে ছেলেটাকেও ডেকে আদর করে।

ছেলেটা অবিরাম কাঁদে। কান্নার কণ্ঠস্বর এত উচ্চ এত কর্কশ যে, শুনে

মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছেলেটার অভিযোগ, পৃথিবীকে সে অভিশাপ দিচ্ছে। ন্যূনতম সময় এক ঘণ্টার কমে তার কান্না থামে না। বেশী সময়ের পরিমাণ বলতে গেলে, বলা যায় না। পরিমাণ নির্ণয় করবার ধৈর্য বাড়ির কারও হয়নি। তাকেও সেদিন সে আদর ক'রে কান্না থামায়। কিন্তু তেমন দিন জীবনে আসে কদাচিৎ।

কাল তেমনই একটি দিন গিয়েছে। সকাল থেকেই সে বড় ভাল ছিল। অথচ খেটেছিলও প্রচুর। কলকাতার রাস্তায় সে নিরন্ন দলের আবির্ভাব হয়েছে, সকাল থেকে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত যারা 'ময় ভুখা হুঁ' 'ময় ভুখা হুঁ' বলে মহানগরীকে ভয়াবহ ক'রে তুলেছে, তাদের কয়জনকে খাওয়াতে সে দ্বিতীয় বার রান্না করেছে রাত্রে। বিকেলে থিয়েটারে গিয়েছিল, তারই আবদারে এক জন প্রতিবেশিনীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল। থিয়েটারে গিয়ে এক নতুন বান্ধবী পর্যন্ত জুটে গিয়েছে। সুন্দরী সুশ্রী মেয়েটি এবং তার চঞ্চল শিশুটি সম্বন্ধে সমস্ত পথ এবং সারা রাত্রিটা তার সে কি প্রশংসাময় উচ্ছ্বাস! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তাদের কথা বলেছে। মেয়েটি প্রথম সন্তানের জননী, সবল দুর্মদ শিশুটিকে নিয়ে তার অক্ষমতার কথা বলেছে. আহা! কিই বা বয়েস! পারবে কেন সামলাতে! ছেলেটির দুষ্টুমির কথা বলেছে আর হেসেছে, আমার চুল ধ'রে সে যা টানতে আরম্ভ করেছিল! দেখ না, মাথাটা কি রকম হয়ে গেছে, এ-পাশটা দেখ না। বাবাঃ, ডাকাত ছেলে! কি কাণ্ড!

মা! মা গো! মা! মা! ওমা, চারটে ভাত দেবে মা?

ঘোষের চিন্তায় ছেদ পড়ল। হতভাগ্য নিরন্নের দল এরই মধ্যে চীৎকার শুরু করেছে।

মা-ঠাকরুণ। বাবা গো! বাবা-ঠাকুর! মা গো! ফ্যান দেবে মা? চারটি ফেন-ভাত? মা গো।

একটা নয়, দুটো। মুখে অন্ন ওঠা দায় হয়ে উঠেছে।

বলি হ্যাঁ রে! সকালবেলায় ভাত কোথায় পাবি, শুনি?—প্রফেসারের ছেলেদের একজন বলছে।

চারটি বাসি ভাত দাও বাবু—রাতের এঁটো-কাঁটা।

এঁটো-কাঁটা নেই। বাসিও নেই। এখন যাও।

কি দেশ হ'ল বাবা! দেশে টেঁকা যে দায় হয়ে উঠল!—তেতলার গৃহিণী বলছে।

তেতলার কর্তা সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াচ্ছে। "ত্রাহি দুর্গে। ত্রাহি দুর্গে।" বললে, দুর্গাকে ডাক। দুর্গাকে ডাক। ভীষণ মন্বন্তর। হতভাগারা একবার ভগবানের নাম করে না। ওদের দুর্দশা ঘোচাতে তুমি পার, না আমি পারি? রাস্তায় প'ড়ে মরছে। আজই কাগজ দেখ না—'কলিকাতায় পঁয়ত্রিশ জনের অন্নাভাবে মৃত্যু!'

বাপ রে!—শিউরে উঠল চাঁপা।

তেতলার গৃহিণী ডেকে বললে, এখন যা বাপু, এখন যা।

দোতলার প্রফেসারের স্ত্রী ডেকে বললে, দেখেছেন ক'জন জুটেছে?

ক'জন?

পাঁচজন।

মা গো। পাঁচজনকে কি একটা দুটো গেরস্ত থেকে দেওয়া যায়?

দোতলার গৃহিণীর স্বামী অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নন: গৃহিণী কিন্তু হিসাবে পাকা, বললে বেয়াল্লিশ টাকা মণ চাল!

দেখ দেখ, আর পাঁচ বাড়ি দেখ! তোদের বিবেচনা নেই বাবা?

গঙ্গায় স্নান ক'রে আগে ঘোষ-গৃহিণী অনেকটা সুস্থ শান্ত হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত, মাথার জ্বালাটা অনেকখানি ক'মে গেছে। একটি

নিশ্চিত পারলৌকিক প্রাপ্তি সম্বন্ধে ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে সে বাড়ী ফিরত। গামছার আঁচলে থাকত চাল, কিছু আধলা, সেইগুলি রাস্তায় ভিক্ষুকদের দিয়ে মনে মনে সে ধন্য হয়ে যেত।

আজ কিন্তু গঙ্গাস্নানটাও তার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

পথে পা বাড়াবার উপায় নেই, নিশ্বাস নিতে বমি আসে। চারি-পাশে শুধু ময়লা আর নোংরামি। ভিক্ষুকদের দল রাস্তায় ফুটপাথের ওপরে দিব্যি সংসার পেতে বসেছে। রাত্রে ফুটপাতের ওপরে কোন বারান্দার নীচে, কোন কার্নিসের তলায়, কেউ বা গঙ্গার ধারের গাছতলায় শুয়ে কাটিয়েছে; সকালে চারিদিক ময়লা মাটিতে ভরিয়ে দিয়ে, মাটির হাঁড়ি, কলাই-করা লোহার থালা, ভাঁড়, ছেঁড়া মাদুর গুটিয়ে বেশ আমেজ ক'রে ব'সে গিয়েছে। ওই ময়লা মাটির জন্যে লজ্জা নেই, ঘৃণাও নেই। প্রতিটি পরিবার অন্যের সঙ্গে পৃথক হয়ে বসে আছে।

প্রায় প্রতিদিনই সে এই পথে যায় আসে। কিন্তু কোনদিন এদের দেখে এমন মনে হয় নি। আজ দেখে সে অবাক হয়ে গেল যে, দুঃখট কান্নাটা অনেকখানি পোশাকী ব্যাপার। লোক দেখলেই সেই পোশাকে সেজে এরা কাতরায়। লোকের দোরে গিয়ে ককিয়ে কেঁদে ভিক্ষা চায়। নইলে এই তো বেশ রয়েছে। দিব্যি পথের ওপর সংসার পেতে বসেছে।

একজন প্রৌঢ়া কতকগুলি পোড়া বিড়ি সংগ্রহ করেছে; বিড়িগুলি দু'ভাগে ভাগ ক'রে রাখছে। অপেক্ষাকৃত বড়গুলি স্বতন্ত্র ক'রে দিচ্ছে তার বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলেটাকে। হ্যাঁ, ওটা তার ছেলেই, মুখের আদল দেখেই বোঝা যায়। ছোটগুলি দিচ্ছে একটি মেয়েকে; ওরই মেয়ে নিশ্চয়। মেয়েটা পোড়া বিড়ির পাতা খুলে তামাক সংগ্রহ করেছে, দোক্তা ক'রে খাবে। প্রৌঢ়া ছেলেটাকে বললে, যা দিকিনি, পানের পাতা ছেঁড়া কুড়িয়ে আন। বোঁটাও আনিস।

ছেলেটা বললে, এক পয়সার পান কিনে আনি কেনে মা?

—কিনে আনবি?

—হঁ। কাল তো অনেক ডাবল পয়সা পেলি—আটটা। দে না কেনে একটা।

প্রৌঢ়া সত্যিই দিলে একটা ডবল পয়সা বের ক'রে। বললে, একটু চুন চেয়ে আনিস বাবা।

কালকের ফ্যানটা ডালটা আমি না এলে বের করিস না যেন; দিদি বেশী নিয়ে নেবে। একটা পয়সা থাকবে, ফুলুরি আনব এক পয়সার?

তা আনিস। সব খাস না যেন। দিদিকে একটা দিস।

তোকেও একটা দোবো।

দেখে-শুনে ঘোষ-গৃহিণী অবাক হয়ে গেল। মায়ের স্নেহ, ছেলের শ্রদ্ধা, পান খাবার শখ, ফুলুরির লোভ সবই আছে, সবই চলেছে। শুধু বাড়ির দোরে গিয়ে কাতরাবে।

এদের প্রতারণার জন্য ঘোষ-গিন্নীর মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সমস্ত এদের জাচ্চুরী! কোথায় দুঃখ এদের? হনহন করে সে এগিয়ে চলল।

থাম! থাম! এই হারামজাদা! ওই আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটার ধুলো গায়ে দিবি নাকি? ঘোষ-গৃহিণী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। একজন পুরুষ ফুটপাথে তার পরিবারের দখলী অংশটুকু একটা আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটার মত ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করছে। একজন বুড়ী, বোধ হয় ওই লোকের মা, ঘর গোছগাছ করছে, মাটির খোরাগুলো গঙ্গাজলের কল থেকে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে একপাশে রেখেছে, এখন পরিষ্কার করছে একটা রঙচিত্র কলাই-করা গামলা। একটি যুবতীর আক্ষেপের শুশির আর অন্ত নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাতে ছোট একটা শিশুকে দুলুচ্ছে

ওপর দাঁড় করিয়ে আমোদ জুড়ে দিয়েছে। ছেলেটার দিকে চেয়ে উলু দিচ্ছে—উলু-লু-লু-লু।

ছেলেটা খিলখিল ক'রে হাসছে।

ঘোষ-গৃহিণীর সর্বাঙ্গ যেন জ্ব'লে গেল। হাসতে এদের লজ্জা করে না! মানুষের পথ জুড়ে সংসার পাতার পরিপাটি দেখে গালে হাত দিতে হয়। পেটে ভাত নেই, তবু মায়ে-পোয়ে বউয়ে-নাতিতে মিলে হাসির হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছে! বেহায়াপনার একশেষ!

পথে চলবার উপায় নেই। একটার পর একটা সংসার। এবার শুধু দুটি মেয়ে। নিশ্চয় মা আর মেয়ে। এই সকালবেলাতেই অল্প-বয়সী মেয়েটি বুড়ীর মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে উকুন বাছতে শুরু ক'রে দিয়েছে, বুড়ী চিবুচ্ছে বাসি রুটি।

আর দুটি মেয়েও অল্প দূরে বসে রুটি চিবুচ্ছে। তাদের একজন বলছে, আটার রুটিগুলো তুই বেশী খাস নে মাসী, হজম হতি চায় না পেরথম পেরথম। আমরা যখন পেরথম এয়েছিনু, তখন এই আটার রুটি খেয়ে কি যেন হ'ল পেটের মধ্যি—হুড়হুড়, হুড়হুড়! মনে হ'ল, পরাণডা বুঝি গেল।

বুড়ী আপনার আধ-খাওয়া রুটিখানা, পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে দিলে, বললে, এডা তবে তুই খেয়ে নে বাসিনী। হাঁ কর, আমি দিয়ে দিই মুখে।

মেয়েটা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

বুড়ী বললে, মরণ, হাসিস ক্যানে?

তুই যে গলায় দিচ্ছিস রুটিটা গুঁজে। সুড়সুড়ি লাগে না?

ঘোষ-গিন্নী মনে মনেই বললে, মর, মর, তোরা মর! মরে না হতভাগা-হতভাগীরা!

মরেছে। একটু দূরে এগিয়ে গিয়েই ঘোষ-গিন্নীর নজরে পড়ল, একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে মরেছে। তার মা কাঁদছে বুক চাপড়ে।

এও বিসদৃশ লাগল তার চোখে। না খেয়ে মরতে বসেছে, পেটের জ্বালায় খাক হয়ে যাচ্ছিস, দিন দিন—ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে। যে মরেছে সে খালাস পেয়েছে। তার জন্যে এত কান্না কেন?

অন্য একটা ভিখিরীর মেয়ে আর দুটো ছেলেকে তার কোলের কাছে দিয়ে বললে, কাঁদিস নে। ও মা মানী, কাঁদিস নে। এ দুটোর পানে চেয়ে দেখ। এ দুটোরে বাঁচা। যেটা গেল ওটা তোর শত্তুর, ওটা তোর ছেলে না।

মেয়েটা তবু কাঁদছে বেহায়ার মত। ওরে সোনা রে!

গিন্নী এবার আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, ব'লে উঠল, সক্কালবেলা আর কাঁদিস নি বাপু। 'ভাত, 'ভাত' ক'রে বেরিয়েছিস, পথে প'ড়ে আছিস, তার ওপর পলুপোকার ঝাঁক। একটা গেছে তো তার জন্যে কাঁদে না। আদিখ্যেতা করিস না।

আশপাশের লোকজন স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রথমটা কারুর মুখে কথা যোগাল না পর্যন্ত। ছেলেটার মা পর্যন্ত অবাক হয়ে তার দিকে চাইলে একবার। ঘোষ-গৃহিণী একরকম ছুটেই এবার চ'লে গেল। গঙ্গার ঘাটে এসে হুড়মুড় ক'রে জলে নেমে পড়ল। জলে নেমে সে বার বার ভাবলে, কিসের জন্যে সে লোকের কথাকে গ্রাহ্য করবে? সে সত্যি কথাই বলেছে। খাঁটি সত্যি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চোখ মেলে সে ওদের তন্নতন্ন ক'রে দেখেছে।

লোকে পথে চলে—কাজের ঝোঁকে, আনমনে, সংসারের ভাবনায়, চোখ চেয়ে থাকে, কিন্তু দেখতে পায় না, দেখে না; যতটুকু এদের দিকে তাকায়, তাতে দেখে, ওরা পথে প'ড়ে আছে, ওদের ছেঁড়া ময়লা কাপড়, ওদের হাতের মাটির হাঁড়ি; কানে শোনে কেবল ওদের ভিক্ষে চাওয়ার কাতরানি। মনে ভাবে, কত দুঃখ, কত কষ্ট!

সে যে আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এল, শুনে এল ওদের ভেতরটা, ওদের অন্তরের আসল কথা। দুঃখ! কষ্ট! সব ধাপ্পাবাজী!

ফেরবার সময় তবুও সে ঘোমটা দিলে এক বুক। অনুমান তার মিথ্যে নয়। মরা ছেলেটা এবং তার মাকে ঘিরে বেশ একটি জনতা জ'মে গিয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা হচ্ছে তারই কথা। গাল দিচ্ছে তাকে। আর পয়সাও দিচ্ছে। পয়সা বাজারে নেই, ডবল পয়সা—তার মধ্যে আনি, দোয়ানি, সিকি, আধুলি; টাকাও দিয়েছে দুজন—মেয়েটা হাতে ধ'রে রয়েছে দুখানা এক টাকার নোট।

তাকে গাল দিচ্ছে, হারামজাদা মাগীর নরকেও ঠাঁই হবে না!

সাত জন্ম ওর ছেলে হবে না।

ভগবান যদি থাকে, এ জন্মেই ফলবে; এ জন্মে যেগুলো হয়েছে, সেগুলোও থাকবে না।

বাড়িতে ফিরেও কি শান্তি আছে! আপিসের ভাত আর আপিসের ভাত! মানুষের শরীরের ভাল-মন্দ নেই, সুখ-অসুখ নেই, উনুনের গনগনে কয়লার আঁচের সামনে দাঁড়িয়ে ভোর থেকে পুড়তেই হবে। আপিস! সাড়ে আটটায় ভাত, আন ভাত!

ঘোষ বললে, আমি নামাচ্ছি ভাতের হাঁড়ি। তুমি বরং—

স্ত্রী চীৎকার ক'রে উঠল, না না না।

সস্নেহকণ্ঠে ঘোষ বললে, ছি! এমন ধারা করে না। তোমার শরীর ভাল নেই—

না না না। আমি মাথা-মুড় খুঁড়ব ব'লে দিচ্ছি।

তীক্ষ্ণ তীব্র উচ্চ কণ্ঠস্বর, আশপাশের বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। ঘোষ সভয়ে পিছিয়ে এল। আশ-পাশের বাড়ির মেয়েদের কাছে ঘোষ-গিন্নীর চীৎকার প্রায় নৈমিত্তিক

ব্যাপার ; কিন্তু আজকের চীৎকার নৈমিত্তিকতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ; মনে হচ্ছে, বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ক্রমাগতই ওপরে উঠছে, ওই যে বহু ঊর্ধলোকে চিলগুলো উড়ছে—কালো কালো বিন্দুর মত, ওই যে চিলগুলোও যেন চকিত হয়ে উঠল ; ঘোষ-গিন্নীর চীৎকার ওদেরও অতিক্রম ক'রে ওপরে উঠছে পুরাকালের বাণের মত। এজন্য তারা আজ কৌতূহলী হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী এসেছিল নীচে। সে দুঃখিত হ'ল ঘোষের জন্য। ঘোষ তাকে 'মা' বলে। ঘোষের স্ত্রীর জন্যও সে বেদনা অনুভব করলে। সস্নেহ কণ্ঠে সে ডেকে বললে, আমি চাঁপাকে ডেকে দিচ্ছি বউমা। তোমার শরীর খারাপ—

তাতে আপনার কি?—সে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন গড়াতে লাগল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। শুধু সে একা নয়, চারিদিকে সমবেত প্রতিবেশিনীরাও অবাক হয়ে গেল।

চাঁপার কাজ আমি নোব কেন? সে আমার কে? এবার সে উনুনের ওপর কড়া চড়িয়ে দিলে।

মাস পোয়ালেই পাঁচ দিনের দিন আমি ভাড়া পৌঁছে দিই। একদিন কি, এক ঘণ্টা, এক মিনিট দেরি হয় না।—বড় বড় কয়েক-খানা বেগুন-ফালি সে কড়াতে ছেড়ে দিলে। বঁটি টেনে নিয়ে কয়েকটা পটল কুটে ফেললে।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী এবার উত্তপ্ত হয়েই বললে, আমি মা বলেছি, তার কি এই জবাব বউমা?

ঘোষ সন্তর্পণে স্ত্রীকে আড়াল দিয়ে হাতজোড় করলে। কিন্তু বাড়িওয়ালার স্ত্রী শান্ত হ'ল না।

ঘোষ-গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, নিশ্চয়। কিসের খাতির? কেন খাতির করব? ওই রকম খোঁজখবর মায়া-ছেদ্দার আমার দরকার নেই। —বেগুনভাজা শেষ ক'রে সে পটলগুলি কড়ায় ছেড়ে দিলে।

ঘোষ এবার বললে, ছি! কি করছ? কি বলছ?

কেন ছি? কিসের ছি? মায়া-ছেদ্দাতে তো আমি ম'রে গেলুম। আপনাদের খেয়াল-খুশিমত এসে চাঁপা বলবে, মাথা ধরেছে বউদি? উনি একদিন এসে বলবেন, শরীর খারাপ, চাঁপাকে পাঠিয়ে দোব বউমা? ও ছেদ্দায় কি দরকার আমার? ঝাড়ু মারি এমন ছেদ্দার মুখে।

এবার বাড়িওয়ালার স্ত্রী রাগে ফেটে পড়ল, মুখ সামলে কথা ব'লো বাছা!

ঘোষের স্ত্রী মাছের ঝোল চড়াবার আয়োজন করছিল। সে উঠে দাঁড়াল, বললে, কেন, মারবেন নাকি? না, বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন? দিন দেখি,—আপনার তো লোকবলের অভাব নেই। আপনার ছেলেরা, দোতলার সুয়ো ভাড়াটের ছেলেরা, সবাইকে আসুন জুটিয়ে দেখি!

দোতলার অধ্যাপকের গৃহিণী বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে সমস্ত শুনছিল। মুখের ভাবে ফুটে উঠছিল বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সে এবার রেগে, খোঁচা-খাওয়া সাপের মত ফণা তুলে ফোঁস ক'রে উঠল, আমায় কেন জড়াচ্ছেন আপনি? ওঁর সঙ্গে হচ্ছে, যা হয় ওঁকে বলুন। আমি কি করলাম আপনার? আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

সাবধান! কার সাধ্যি আমাকে সাবধান করে? কার কিসের ধার ধারি আমি? ভাঁড়ারের হাঁড়ি থেকে ঘোষ-গিন্নী বের করলে মুগের ডাল। কুলুঙ্গি থেকে নামালে স্টোভটা। ঘোষ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে;— মুখে ধ'রে আছে নিবে-যাওয়া বিড়িটা; এক হাতে ধ'রে আছে দেশলাই, অপর হাতে একটা কাঠি।

আমিই বা কি ধার ধারি আপনার? আমায় কেন বলবেন আপনি? সত্যি কথা বলছি আমি। আমি কাউকে ভয় করি না। আপনারা সুয়ো ভাড়াটে। তেতলা থেকে এ-দিদি নেমে আসছেন, অ দিদি, সকাল থেকে যান নি কেন? সাড়া পাচ্ছি না কেন? দোতলা থেকে ও-দিদি তেতলায় উঠছেন, অ দিদি, রাগ করেছেন নাকি? দেখা নেই যে?

স্টোভটা ধরিয়ে ফেলে ঝোলের কড়াটা স্টোভের ওপর চাপিয়ে দিয়ে উনুনে সে মুগের ডাল চড়িয়ে দিলে।

আমিও ধান-চালের ভাত খাই। আমারও চোখ আছে। কালাও নই আমি। সবই দেখতে পাই, সবই শুনতে পাই। আমি সত্যি কথা বলব। আমি কাউকে ভয় করি না। মানুষ দূরের কথা, যমকে ভয় করি না আমি। আসুক যম আমার সামনে, তাকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঠিক এমনই ক'রে বলব। খানিকটা আমসত্ব বের ক'রে দুধ দিয়ে সেটা সে মাখতে লাগল এবং ব'কেই চলল।

এবার বাড়িওয়ালার গৃহিণী ওপরে উঠে গেল। দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রীও চুপ ক'রে গেল; তারা পরাজয় তো মেনেছেই, উপরন্তু ভয়ও পেয়েছে। যমকে যে ভয় করে না, তাকে ভয় না করে উপায় কি? যমকেই যে তাদের যথেষ্ট ভয়।

ঘোষ-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত ধুয়ে ফেললে। ঘোষকে তেল দেবে, গামছা দেবে, কপড় বের করবে, জামা দেবে। চারিদিকে তাকিয়ে সে আরম্ভ করলে, দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন সব। এদের মত এমন আর দুনিয়াতে হয় না। কেউ ছেলের কাঁথা, কেউ ছেলের কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কাঁথা তুলছেন, কাপড় মেলে দিচ্ছেন। কেউ কিচ্ছু জানেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সকল বাড়ির বারান্দা শূন্য হয়ে গেল। সকলেই সুটসুট

ক'রে যে যার ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল।

ঘোষ-গিন্নী ব'কেই চলল। ঘোষ আশ্বস্ত হ'ল, এবার ও চুপ করবে। চুপ না করলেও সমস্ত তারই ওপর বর্ষিত হবে। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় বিরূপ। বাইরের দরজায় একটা ছেলে অত্যন্ত কাতর স্বরে ডাকলে, মা গো! মা! মা! মা! মা গো!

কে র‍্যা? কে? কে তুই?

চারড্ডি খেতে দাও মা। চারড্ডি ভাত দাও।

আবার ঘোষ-গিন্নী চীৎকার ক'রে উঠল, বেরো বেরো বেরো, জোচ্চোর মিথ্যেবাদী! বেরো!

ছেলেটাও নাছোড়বান্দা, সেও সমানে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ম'রে গেলাম গো, জ্ব'লে গেল গো, ওগো মা গো।

এই হারামজাদা, বদমাস, শয়তান! বেরো বলছি, বেরো!

চারড়ি ফ্যানভাত দ্যাও মা। আমি ম'রে গেলাম মা গো!

যা যা, তুই ম'রে যা। মরণ যদি না হয় গলায় দড়ি দিগে যা। গঙ্গায় ডুবে মরগে যা।

ছেলেটা কাতর স্বরে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে—ওরে মা রে! ওরে বাবা রে!

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে কে ডেকে উঠল, মা গো, চারড্ডি ফ্যানভাত ছাও মা! কচি ছেলেডার মুখের দিকি তাকাও মা! মা গো!

ঘোষ-গিন্নী ক্ষেপে গেল। পুলিস ডাকব আমি। পুলিস ডাকব। বেরো বলছি, বেরো, নইলে পুলিস ডাকব আমি।

মেয়েটা সভয়েই চ'লে যাচ্ছিল, ছেলেটাও যাচ্ছিল, কিন্তু সে তখনও তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, জ্ব'লে গেল, মা গো! ওগো মা গো!

যাস না, এই ছেলে, এই মেয়ে, যাস না, দাঁড়া। এই!

তেতলা থেকে ডাকছে তেতলার গৃহিণী। দোতলা থেকে ডাকছে অধ্যাপকের স্ত্রী!

মেয়েটা সভয়ে বললে, পুলিসে দেবে বলছে মা।

ব'স ওইখানে। দেখি আমি, কে পুলিসে দেয়!

তারস্বরে ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, ওগো মাগো!

এমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন?

পাঁচড়া হয়েছে মা! জ্ব'লে গেল মা!

ঘোষ-গিন্নী বললে, পাঁচড়ার জ্বালা খেলে বুঝি থামে? খবরদার বলছি, চেঁচাস নি।

বাড়ীওয়ালার স্ত্রী ডেকে বললে, এই দিকে এসে ব'স। এই দিকের রজায়। ওটায় নয়। হ্যাঁ, ব'স। সে দেখিয়ে দিলে নিজেদের দরজা।

প্রফেসরের স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আহা-হা! ম'রে যাই র! দেখলে বুক ফেটে যায়। ব'স মা, ব'স বাবা, ব'স।

ওরে চাঁপা, যা দিয়ে আয় ভাত।

একটা পুরো থালা ভাত-তরকারি রীতিমত অতিথি-সৎকারের আয়োজন সাজিয়ে মা মেয়ের হাতে তুলে দিলে।

ছেলেটার জন্যে দিলে দুখানা রুটি। বললে, পাঁচড়া হয়েছে, ভাত খেলে বাড়বে।

দোতলার প্রফেসার-গিন্নী নিজেই সাজালে থালার ভাত। ছেলেটার ন্যে নিলে একখানা পাঁউরুটি।

ঘোষ-গৃহিণী তখনও বকছে, কিন্তু ওপরের এদের এই সকরুণ বদান্যতায় ঠাৎ সে যেন কেমন দ'মে গেছে। তার কাছে পরাস্ত হয়ে যেমন ওরা প করেছিল, ঘোষ-গিন্নীও এবার তেমনই যেন পরাস্ত হয়ে পড়েছে। মনে চ্ছে, এমন নিষ্ঠুর তিরস্কার তারা তাকে করেছে, যার উত্তর তার জানা

নেই। তার মুখের ওপর তারা চাবুক মেরেছে। জিভ যেন কেটে গিয়েছে।

শুধু দোতলা তেতলা নয়, আশপাশের বাড়িগুলি থেকেও আসছে খাদ্য; নিরন্নদের অন্ন, উচ্ছিষ্ট এঁটো-কাঁটা নয়, নিজেদের অন্নব্যঞ্জনের ভাগ।

ছোঁড়াটার পাঁচড়ার জ্বালার চীৎকার থেমে গেছে। সে রুটি চিবুচ্ছে। মেয়েটা ভাত-তরকারি নিয়েছে নিয়েছে নিজের হাঁড়িটা ভ'রে। একটা ছোট ভাঁড়ে কেউ খানিকটা দুধও দিয়েছে, একটা ঝিনুকের খোলা দিয়ে ছেলেটাকে সে দুধ খাওয়াচ্ছে। আরও কয়েকজন এসে জুটে গেছে। তারাও খাচ্ছে। দাতাদের আশীর্বাদ করছে।

ঘোষ আপনার ঘরে খেতে বসেছে। খাবারের থালার সামনে ব'সে সে লজ্জিত হ'ল। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারলে না! আয়োজন বিচিত্র এবং প্রচুর—ভাত, মুগের ডাল, বেগুনভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল ও ঝাল, বাড়িতে পাতা দই, আমসত্ত্ব। সাধারণতঃ সে খেয়ে যায়—ভাত, ডাল, ভাজা অথবা ভাতে, মাছের ঝোল; দইটা থাকেই। তার স্ত্রীকে সে বুঝতে পারে না। শরীর-খারাপ নিয়ে এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? আর দরিদ্র নিরন্নদের নিষ্ঠুরতম কটু কথা বলার পর এত আয়োজন তার মুখে রুচবেই বা কি ক'রে?

তবু সে বললে, এত কেন করলে? কি দরকার ছিল?

স্ত্রী স্বামীর চাদরখানা নিয়ে কুঁচিয়ে পরিপাটী ক'রে তুলছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসবারও যেন চেষ্টা করছিল। ওই কথাতেই তার আবার কি হয়ে গেল,' ব'লে উঠল, আমি জানি, আমার সেবাযত্ন তোমার ভাল লাগে না, আমি রাঁধতে জানি না। তোমার ভাই, ভাজ, ভাইপো ভাইঝি যে যত্ন করে, সে আমি পারি না।

সেই কথাই চলতে লাগল। ঘোষ নীরবে খেয়ে উঠে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘোষ-গৃহিণীর মনে হ'ল, এতক্ষণে কাজ শেষ হ'ল,

সে বাঁচল। বিছানায় সে শুয়ে পড়ল।

ওপরে—দোতলায় তেতলায় কোলাহল উঠছে, "দানের তুল্য ধর্ম নেই। দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান অন্নদান! ভগবান, এই মতি যেন চিরদিন দিও।"

ঘোষগিন্নী মুখ বাঁকালে। বাইরে এখনও ভিখারীরা কাতরভাবে 'ভাত' 'ভাত' ক'রে কেঁদে ফিরছে। তার ঘরে আজ অনেক উচ্ছিষ্ট। তবু সে দেবে না, কিছুতেই না। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসছে না। মাথা এখনও জ্বলছে। সে উঠল, মাথায় জল দিলে, ঘুরে ঘুরে বেড়ালে সঙ্কীর্ণ অপরিসর বারান্দায়, এ-ঘরে ও-ঘরে। বাক্স খুললে, গয়নাগুলো মেলালে, বন্ধ করলে। আবার শুল।

উঃ! মাত্র এই সাড়ে বারোটা! ও-বাড়িতে এইমাত্র রেডিও বেজে উঠল। ওই এক জ্বালা! কানের কাছে ঘ্যান—ঘ্যান। সে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু তবু ঘুম এল না। আবার সে জানালা খুলে দিলে। রেডিওটা বাজছে। বাজুক। মাথা তার এখনও জ্বলছে। কাল সেই রাত্রি থেকে জ্বলছে, তার সেই পাগলা মাথা-ধরা উঠবে। সেই যে কাল রাত্রে নবপরিচিত মেয়েটির অশান্ত ডাকাত ছেলেটা মাথার চুল ধ'রে টেনেছে, তখন থেকেই এ দিকটায় বেদনা হয়েছে, বেদনাটা বেড়েছে। এইখান থেকেই বেদনাটা আজ সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। অসহ্য বেদনা। রগের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। দুনিয়া তেতো কি কম যন্ত্রণায় হয়!

হঠাৎ মনে পড়ল তার মৃত মা-বাপকে। দশ বৎসর আগে তারা মারা গেছে।

তাদের জন্মে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল।

শেষ

এই লেখকের

ইমারৎ
আগুন
তামস-তপস্যা
পাষাণ-পুরী
ছলনাময়ী
হারানো সুর
রাই কমল
ধাত্রীদেবতা
কালিন্দী
পঞ্চগ্রাম
তিনশূন্য
নীলকণ্ঠ
দুই পুরুষ
দ্বীপান্তর
পদ চিহ্ন
আরোগ্য নিকেতন
শ্রেষ্ঠ-গল্প
প্রিয়-গল্প

সন্দীপন পাঠশালা
জলসাঘর
প্রতিধ্বনি
মন্বন্তর
কবি
দিল্লীকা লাড্ডু
চৈতালী ঘূর্ণি
রসকলি
গণদেবতা
১৩৫০
যাদুকরী
পথের ডাক
বিংশ শতাব্দী
বিচারক
অভিযান
কৈশোর স্মৃতি
রাধা
পঞ্চ-পুত্তলি

নাগিনীকন্যার কাহিনী